প্রজ্ঞা

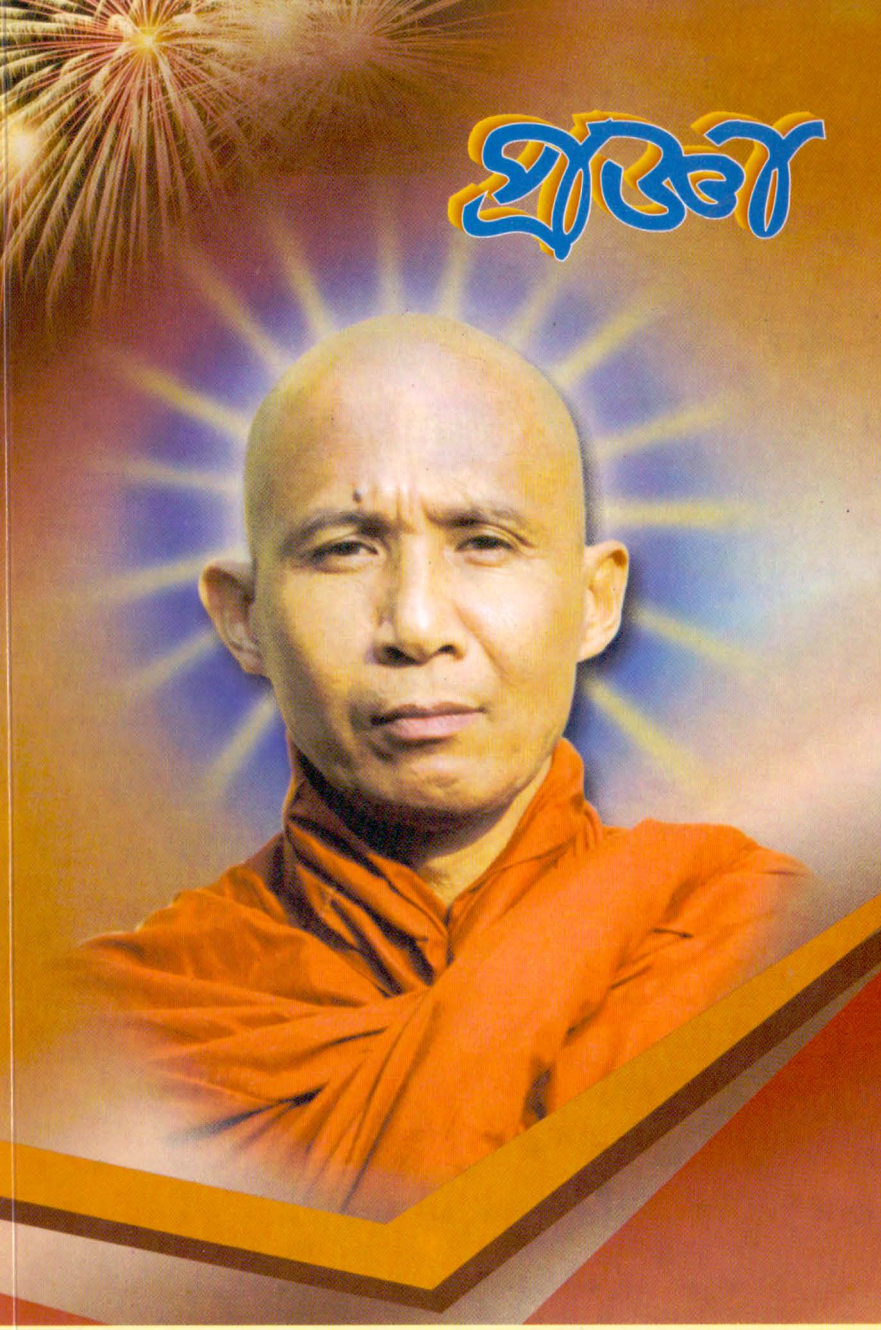

আর্যবন বিহার

ধর্মপুর, খাগড়াছড়ি।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvananda Bhante

প্রজ্ঞা

(ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির- এর ৫৮তম জন্ম দিনের স্মারক পুস্তিকা)

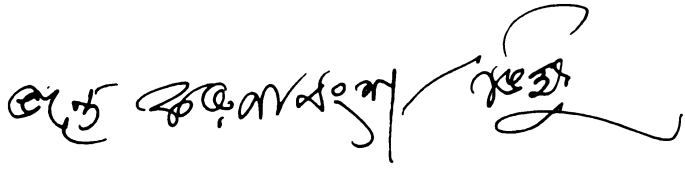

সম্পাদনা ঃ
ভদ্দীয় ভিক্ষু
সরনংকর ভিক্ষু

ধর্মপুর আর্যবন বিহার
পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি।

সম্পাদকীয়

আজ ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ইং। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের শুভ জন্মদিন। আজ হতে ৫৮ বছর আগের ঠিক এই দিনে ১৯৫১ সালে খাগড়াছড়ি জেলাস্থ গামাঢ়ী ঢালা গ্রামে এ পুণ্যপুরুষের জন্ম হয়।

এমন কিছু পুণ্যপুরুষ এই ধরণীতে জন্ম গ্রহণ করেন যাঁদের মেধায়, প্রজ্ঞায়, গবেষণায় ও আত্ম-ত্যাগের মহিমায় সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র তথা জাতি দিকে দিকে উন্নতির পথে ধাবিত হয়। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজেও তেমনি এক বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়। শ্রদ্ধেয় ভন্তে একাধারে লেখক, গবেষক, অনুবাদক, সদ্ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক এবং সর্বোপরি তাঁর আদর্শ জীবন শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় বিমণ্ডিত।

ধর্মপুর আর্যবন বিহারের উপাসক-উপাসিকা পরিষদের উদ্যোগে প্রথম বারের মত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় আজ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে তাঁর ৫৮তম জন্মদিন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আজকের এই দিনটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের নবজাগরণের ইতিহাসে জায়গা করে নিল। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই– বিশেষ কোন মহান ব্যক্তির বা কোন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশিত করা হয়। এ ধরনের প্রকাশনা জ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের গতিবেগকে বেগবান করতে সাহায্য করে এবং দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই এমনি এক মহৎ উদ্দেশে এ মহান সাংঘিক ব্যক্তিত্বের জন্মদিনের স্মৃতিকে ধরে রাখার লক্ষ্যে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস– **"প্রজ্ঞা"** নামক প্রকাশনা।

এখানে যাদের লেখা স্থান পেয়েছে তারা অধিকাংশই নবীন, কেউ কেউ অপরিচিতও। আর সম্পাদনার মত কঠিন ও দুরূহ কাজে আমরা সম্পাদক দ্বয়ও একেবারে নবীন। একতঃ আমাদের অনভিজ্ঞতা, তদুপরি সময়ের স্বল্পতা হেতু স্বভাবতঃই প্রকাশনায় ভাষাগত ও মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকতে পারে। তাই বিজ্ঞ পাঠকমহল তা আপন উদার্য্যে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখলে কৃতার্থ হবো।

যাঁরা মূল্যবান বাণী, প্রবন্ধ, কবিতা দিয়ে **"প্রজ্ঞা"**কে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ জানাই। আর আমাদের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেবর সংক্ষিপ্ততার দরুণ যাদের লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না; তাদের নিকট সম্পাদনা পরিষদ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আমাদের আহ্বানে সাড়াদিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তের **'জন্মোৎসব'**কে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্যে যারা কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাদের সকলের প্রতি উপাসক-উপাসিকা পরিষদ ও সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

–সম্পাদকদ্বয়

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

০১. ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য
-ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু---------- ০৯

০২. আমার অনুভবে বিনয়ধর ভিক্ষু প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির
ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ---------২১

০৩. বহুমুখী প্রতিভার এক অনন্য পুরুষ
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু ---------- ২৪

০৪. প্রজ্ঞালংকার ভন্তে
ভদন্ত অনোমদর্শী থের ---------- ৩০

০৫. বনভন্তের বিনম্র শিষ্য প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির
আদিকল্যাণ ভিক্ষু---------- ৩২

০৬. শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের কর্ম ও জীবন জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু---------- ৩৬

০৭. বুদ্ধ ঃ এক আলোক বর্তিকা –আবুল ফজল----- ---------- ৩৮

০৮. হিতজন রত্ন কুমার চাকম---------- ৪৫

০৯. বুদ্ধের দোকান বা আপণ কিষ্ট লাল চাকমা ---------- ৪৭

১০. জ্ঞানের ভাণ্ডার শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞা ভন্তে সুমতি রঞ্জন চাকমা---------- ৪৯

১১. নীরব দর্শন রত্ন কুমার চাকমা ---------- ৫১

১২. কিছু কথা নন্দীদেবী চাকমা ---------- ৫৫

কবিতা

০১. এত সুন্দর তুমি প্রজ্ঞালংকার পূর্ণময় চাকমা	পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৯	০৫. নির্বাণ দর্শন বি. ভিক্ষু	পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৪
০২. প্রথম জন্মোৎসবে অনূঢ়া চাকমা	৬০	০৬. ধর্ম গুরু জিনা চাকমা	৬৫
০৩. অনিত্য সংসার রিমি ও ঝিমি দেওয়ান	৬১	০৭. ঘন কুয়াশার নীড়ে আর. কে. ভিক্ষু	৬৬
০৪. প্রার্থনা রিয়া, মায়া ও শাসনা	৬২	০৮. আজি তোমারি স্মরণে গিরিমানন্দ ভিক্ষু	৬৮

প্রবন্ধ

ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

-ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

বর্তমান বিশ্ব বৌদ্ধ জগতে আধ্যাত্মিক সাধন ভূবনে যিনি এক উচ্চতম মর্যাদার আসনে সমাসীন এবং যাঁকে নিয়ে আজ মানব সমাজ ধন্য তিনি দেব-মানবের পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)। পূজ্যস্পদ বনভন্তের ভিক্ষু শিষ্যের মধ্যে প্রথম তথা সর্বজ্যেষ্ঠ শিষ্যটি হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির। এরূপ দুর্লভ পদের অধিকারী হওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। বহুজন্মের কৃত পুণ্য ও বিরল পারমী পরিপূরণের সুফলই বলতে হয়। এমনি পুণ্যশ্লোকা সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির'র জীবনালেখ্য তুলে ধরার সামন্যতম প্রচেষ্টা আমার এ লেখনিতে। জানি না এ'প্রচেষ্টায় কতটুকু সফলকাম হবো; আমার অদক্ষ হাতের ছোঁয়ায় তাঁকে কিভাবেই-না উপস্থাপন করতে যাচ্ছি পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে।

জন্ম-জনপদ– আকাশের হেলান দিয়ে ঘুমায় দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের সারি। আকাশের নীল ছুয়ে যাওয়া সবুজের সমাবেশ, খরস্রোতা চেঙ্গী নদীর কলতান। এ'যেন প্রকৃতির সমোহিত মায়ালোক। সব সৌন্দর্যের পসরা খূলে পড়েছে যেন। প্রকৃতির অকৃপন হাতে গড়া এরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। জেলা সদর হতে ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ছায়া-সুনিবিড় একটি চাকমা পল্লীগ্রামের নাম "গামারীঢালা"। সেই গ্রামের এক মধ্যবিত্ত চাকমা পরিবারে ১৯৫১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী, রোজ বৃহস্পতিবার, এক শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন বীরলোচন চাকমা (বর্তমানে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থরিব)। তাঁর পিতার নাম জেরবুয়াধন চাকমা, মাতার নাম বড়চোগী চাকমা। পিতা-মাতা

প্রাণের প্রত্যাশা পুত্র সন্তান লাভ করে আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। পুত্রের নিষ্পাপ কচিমুখ দেখে তাদের সর্ব শরীর পুলকে ঝাঁকার দিয়ে উঠল। মনে-প্রাণে সে-কী এক আনন্দ, প্রীতি সুখের হিল্লোল বইতে লাগল। পুত্রের জন্যে বাঁধভাঙ্গা স্নেহের উৎস উছলিয়ে উঠল বাপ-মায়ের অন্তরে।

জন্মের পর নামকরণ করা হল বীরলোচন চাকমা। আট (৪ ভাই, ৪ বোন) ভাই-বোনের মধ্যে বীরলোচন হলেন দ্বিতীয়, তবে ভাইদের মধ্যে প্রথম। চাকমা গোজাগত পরিচয়ে বাবুরা গোজা, গঝাল্যা গোষ্ঠির বংশজাত সন্তান তিনি। পুত্র সন্তানের মধ্যে প্রথম হওয়ায় তাঁকে নিয়ে মা-বাবার আলাদা একটা টান ও বাড়তি প্রত্যাশা ছিল বরাবরই। ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা শ্যামল অরণ্যানীর অফুরন্ত শোভায় ঋদ্ধ গামারীঢালা গ্রামে শিশু বীরলোচন শশী-কলার ন্যায় বর্দ্ধিত হতে লাগল।

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন– ছোটকাল থেকেই বীরলোচন চাকমা ছিলেন শান্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতির; স্বভাব ছিল তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। সময়ের পরিক্রমায় বালক বীরলোচনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় ঘনিয়ে এল। ছেলেকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করতঃ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাতে স্থানীয় গামারীঢালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন সুযোগ্য পিতা-মাতা। সালটা ছিল ১৯৬২। "বাল্য-শিক্ষা" ও সদ্য কেনা শ্লেট নিয়ে শুরু হয় তাঁর ছাত্র জীবনের হাতেখড়ি। ছাত্রাবস্থায় বেশ বিনয়ী ও মেধাবী ছিলেন বলে জানা যায়। বালক স্বভাব দুষ্টুমী, হৈচৈ, ঝগড়া-ঝাটি করতেন না। দল বেঁধেও চরতেন না। সেই ছেলেবেলা অবস্থায়ও বেশি কথা বলার দোষ ছিল না তাঁর। কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করলে পিতা-মাতা তাঁকে ভর্তি করে দেন মাইচছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে। এভাবে ১৯৬৮ সালে মাইচছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হয় তাঁর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন। আর তিনিও বাল্যকাল পিছনে ফেলে পা রাখেন কৈশোরে। তবে কৈশোরের দুরন্ত-পনা তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। "শিক্ষা ও মেধা-ই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ"– এ' কথা মনে রেখে তিনি (সেই বয়সেও) শিক্ষার প্রতি ছিলেন নিষ্ঠাবান অনুরাগী ও আন্তরিক। রীতিমত পাঠাভ্যাস, নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর ছাত্র জীবনের বৈশিষ্ট্য। চঞ্চল ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে

অবগাহন করলে শরীর ও মনে যেমন কোমল প্রশান্তি আসে, তেমনি বিদ্যার নদীতে সাঁতার কেটে ছাত্র-ছাত্রীরা লাভ করে থাকে এক অনির্বচনীয় আনন্দ। বীরলোচন চাকমাও সেই আঙ্গিকে বিদ্যা অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। আর কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী বিদ্যাতে সীমাবদ্ধ না থেকে সময়োপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতঃ বিভিন্ন বিদ্যা, জ্ঞান আহরণ করতে প্রয়াস চালিয়ে যান। ১৯৭৪ সালে মাইচছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করা কম গৌরবের ছিল না। এরূপ গৌরবময় সাফল্যের পরও তিনি আর উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারেন নি। কারণ তখনো পশ্চাদপদতার আঁধারে ঢাকা খাগড়াছড়িতে সরকারী কোন কলেজ ছিল না। ফলে বীরলোচন চাকমাকে এখানেই ছাত্র জীবনের ইতি টানতে হয়।

যৌবনকাল– পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে এবার তাঁকে মা-বাবাকে সাহায্য করতে স্বীয় জমিতে চাষাবাস করার কাজেও ভূমিকা রাখতে হলো। অন্যদিকে পাড়ার শিক্ষিত ছেলে হিসেবেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ডাক পড়তো তাঁর নাম। একজন শিক্ষিত, ছেলে হিসেবে ও সচেতন যুবক হয়ে সে-সব ডাকে কী- আর সাড়া না দিয়ে পারা যায়? ফলশ্রুতিতে নানা সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত হতে হয় তাঁকে। এ' জনসেবামূলক কাজে অবতীর্ণ হতে গিয়ে তাঁকে অনেক তরুণ-তরুণীর সান্নিধ্যে আসতে হল। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা ও মেলামেশা করতঃ এক সাথে দলবেঁধে কাজ করার দিকে পা বাড়াতে হল। যদিও সেটা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। সেভাবে তরুণ-তরুণীদের সংস্পর্শে এসে বীরলোচন চাকমার মনও রাঙিয়ে ওঠে যৌবনের রঙে। যেন দক্ষিণা-সমীরণে মনে জেগে ওঠে যৌবনের হিল্লোল। এমতাবস্থায় সংসার ধর্ম পালন করার মোহে ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তবে অল্প-কিছু দিনের মধ্যেই সেই প্রলোভন হতে নিজেকে মুক্ত করে আনতে সমর্থ হন তিনি। ধূলিলিপ্ত পাখি যেমন ডানা ঝেড়ে নিয়ে ধূলিমুক্ত হয়। আর জন্মান্তরের নৈষ্ক্রম্য পারমীর সংস্কার জাগ্রত হয়ে সংসারের প্রতি তাঁর মন উড়ু উড়ু ভাব, বিরাগের সঞ্চার হয় দারুণভাবে। তাই গৃহত্যাগের বা প্রব্রজ্যা গ্রহণের এক উদগ্র আকাঙ্খা জাগে মনে।

প্রব্রজ্যা জীবন- ভগবান বুদ্ধ বলেছেন– "সম্বাধো ঘরাবাসো অব্‌ভোকাসো পব্বজ্জা"। গৃহবাস বিঘ্নসংকুল, ঝামেলাপূর্ণ আর প্রব্রজ্যা জীবন মুক্ত আকাশের ন্যায় বাধাহীন। বীরলোচন চাকমা যেন বুদ্ধের সুললিত কণ্ঠে শুনতে পান সেই বাণী। প্রব্রজিত জীবন সম্বন্ধে এরূপ পুলকিত ধ্বনি তাঁকে গৃহত্যাগের ডাক দিতে থাকে ক্রমাগত। সিদ্ধান্ত নেন মুক্তি মশালের দিগন্ত উচ্ছ্বসিত প্রভায় নিজেকে প্রভান্বিত করতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। সংসার দুঃখে নিজেকে সঁপে দেবেন না। বনের পাখী বনেই রমিত হয়, বন্ধ খাঁচায় রমিত হয় না। কাল বিলম্ব না করে তিনি মা-বাবাকে স্বীয় মনোবাঞ্ছা জানায়ে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা করেন। পুত্রের মুখে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার কথা শুনে মা-বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। প্রিয় পুত্র এ-কী বলে! কিভাবে এ' অনুমতি প্রদান করবে তারা? মা-বাপের মন বলে কথা! পুত্র তাদেরকে সারা জীবনের জন্য ছেড়ে চলে যাবে–এটা ভাবতেই তাঁরা সবকিছু অন্ধকার দেখলেন। যেই পুত্র-কন্যাকে তারা স্বীয় জীবনের চেয়ে ভালোবাসেন, প্রিয় ও আদরের বলে জানেন এবং তাদের বিহনে নিজের জীবন বিপন্ন বলে মনে-প্রাণে মানেন, সেই একান্ত প্রিয় সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিনা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রব্রজ্যা নিতে চাইছে। আহা! মা-বাবার মন কি সহজে পুত্রকে ছেড়ে দিতে চায়? অন্যদিকে পুত্রও অনড়, সে কিছুতেই গৃহবাসে থাকবে না। তাই পুত্রের মঙ্গল চিন্তা করে পিতা-মাতা তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। 'মোদের পুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হবে, পরম সুখী হবে' এ' আশায় পুত্র বিচ্ছেদের অনেক কষ্ট বুকে চেপে রেখে মেনে নেন পুত্রের একান্ত সিদ্ধান্ত। মা-বাবা হতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি পেয়ে বীরলোচন চাকমা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। অভীষ্ট আশা পরিপূর্ণ হল। এবার গুরু নির্বাচনের পালা। দুঃখমুক্তি লাভের ইচ্ছা বক্ষে ধারণ করে যখন প্রব্রজিত হওয়া, স্বভাবতই মুক্তিমার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত, অর্হৎ সর্বজন পূজ্য বনভন্তেকে গুরু হিসেবে বেছে নেন তিনি। প্রব্রজ্যা গ্রহণের শুভদিন নির্ধারিত হল ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ২৫২১ বুদ্ধাব্দ, রোজ সোমবার। নির্ধারিত দিনে বিকাল ৫.১৫ মিনিটে বীর লোচন চাকমা দেব-মানবের পূজ্য বনভন্তের নিকট প্রব্রজ্যা-ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬

বছর। পূর্ণ ভরা যৌবনে তিনি নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও পরিশুদ্ধ জীবনাচারে আত্মসমর্পিত হলেন। লোকোত্তর জ্ঞানাধিকারী গুরু প্রিয় শিষ্যের নাম রাখলেন **"প্রজ্ঞালংকার শ্রামণ"**। প্রজ্ঞায় যার অলংকার- সেই প্রজ্ঞালংকার। বলা বাহুল্য যে, নির্বাণ লাভের জন্যে এ' প্রজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রজ্ঞালংকার শ্রামণ্য-ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা বিমণ্ডিত জীবন গঠনে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়। শ্রামণদের প্রতিপাল্য দশশীল, পঁচাত্তর সেখিয় ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর অপ্রমাদ লক্ষ্যণীয়। অন্য যে কোন শ্রামণ হতে তাঁর কথন, ভাষণ, আচরণ দোষমুক্ত। বিশেষতঃ তাঁর বাক সংযম অত্যন্ত প্রশংসনীয়; এ সবের কারণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তিনি গুরুর নিকট হতে বেশ স্নেহ ও প্রীতিধন্য লাভে সমর্থ হন। অপরদিকে গুরু শিষ্যের মধ্যে তিনিই প্রথম সুশিক্ষিত শিষ্য। তাঁর আগে কোন সুশিক্ষিত যুবক আজীবনের জন্যে গুরুর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি। হিতকামী গুরুর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে, স্নেহ ও কঠোর অনুশাসনে প্রজ্ঞালংকার শ্রামণ নিজেকে সর্ব বিষয়ে সুগঠিত, দক্ষ করতঃ বুদ্ধ শাসনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে লাগলেন। সাথে সাথে প্রব্রজ্যা জীবনের পবিত্র, অনাবিল আনন্দানুভব করতে যত্নশীল থাকেন। এ ভাবেই কেটে যেতে লাগল তাঁর প্রব্রজিত জীবনের দিনগুলো।

উপসম্পদা লাভ– প্রজ্ঞালংকার শ্রামণের জীবন পথে নেমে আসলো আরেকটা শুভ মুহূর্ত। এক বছরাধিক প্রব্রজিত জীবন অতিবাহিত করার পর তাঁকে উপসম্পদা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপসম্পদার তারিখ ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রস্তুতি চলতে লাগল। ক্রমে এলো সেই মহান শুভ দিন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ৭ মাঘ, ২৫২২ বুদ্ধাব্দ, রোজ রবিবার। বিকাল ৫.৩০ মিনিটে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের গৌরব, সাংঘিক পুরোধা, শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে প্রমুখ মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের উপস্থিতিতে কর্ণফুলি হ্রদের উপর বাঁশ দিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত **'ভাসমান উদক সীমা'**য় প্রজ্ঞালংকার শ্রামণের শুভ উপসম্পদা কার্য সুসম্পন্ন হয়। সেই পুণ্য তিথিতে যোগদান করতে (তাঁর) গুণগ্রাহী অনেক উপাসক-উপাসিকা ছুটে আসেন রাজবন বিহারে। এই উপসম্পদা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রজ্ঞালংকার শ্রামণ ভিক্ষুত্বে অভিষিক্ত

হলেন। এবার তাঁর নাম হল শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু। উপসম্পদা লাভ করে তিনি বুদ্ধের মহান সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হলেন। বুদ্ধবংশে পুনর্জন্ম হলো তাঁর। তিনি এখন বুদ্ধপুত্র। ভিক্ষু জীবনে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করলেন, শ্রামণ্য জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে এবার ভিক্ষুত্বের বৃহৎ গণ্ডিতে পদার্পণ করেছেন। এখন হতে আত্ম-পর হিতে অশেষ অবদান রাখতে হবে তাঁকে। তজ্জন্য নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে, 'বিনয়ানুশাসন' মতে জীবন যাপন করতে হবে। এ' উদ্দেশ্যকে গুণে গুণান্বিত হতে সচেষ্ট থাকেন এবং পিটকীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য যত্নবান হন। সবার সাথে তাঁর অমায়িক ব্যবহার, মিতভাষী ও বিনয়ের প্রতি অসাধারণ গারবতা এবং সুবাধ্যতা প্রভৃতি গুণে তিনি গুরুর স্নেহ সান্নিধ্য লাভ করেন বেশ ভালোভাবেই। পরম কল্যাণমিত্র গুরুদেব শিষ্যকে উপযুক্ত করে গড়তে স্বীয় জ্ঞান ভাণ্ডার উজার করে দিলেন। এ'ভাবে ভিক্ষু প্রজ্ঞালংকার তাঁর নবজীবনের যাত্রা– অনন্ত জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন। আর কয়েক বছরের মধ্যে নিজের জীবনকে বহু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, জ্ঞাত শক্তিতে শাণিত করতে সমর্থ হন। স্বচ্ছ কাঁচখণ্ড যেমন সুবর্ণের সংঘর্ষে মরকত মণির বর্ণ ধারণ করে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে। এক সময় গুরুদেবের মুখেও শিষ্য সম্বন্ধে প্রশংসিত বাক্য উচ্চারিত হতে থাকে। এর চেয়ে আনন্দদায়ক বিষয় আর কি হতে পারে একজন শিষ্যের জীবনে। গুরু কর্তৃক প্রশংসা বাক্যে সিক্ত হলেও বিনয়ী এ'ভিক্ষু কারোর সাথে রূঢ় ব্যবহার করেননি। নিজেকে জাহির করার দিকে মনোযোগী হননি। তারপরও স্বীয় যোগ্যতা বলে তিনি রাজবন বিহারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভিক্ষু হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন সহসা। ভিক্ষুসঙ্ঘের সকল সদস্য ও দায়ক-দায়িকাগণ তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ। গুরুও তাঁর উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অপর্ণ করে নিশ্চিন্তে থাকেন।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষুর জীবন সাধনা নানামুখী ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। সংযত ও বিনয়াকুল জীবন যাপনের সাথে সাথে তিনি নিজকে পিটকীয় জ্ঞানেও করেছেন সমৃদ্ধ। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে পূজ্য বনভন্তের পার্শ্বেই শোভা পেতো তাঁর সরব উপস্থিতি। যেন পূজ্য বনভন্তের শরীরের পিছু ধাওয়া ছায়া। সে সব অনুষ্ঠানে সমবেত

দায়ক-দায়িকাগণকে পঞ্চশীল প্রদান করা সহ দানোৎসর্গ, সূত্রপাঠ করার দায়িত্ব বর্তাতো তাঁর উপর। এটা জোর দিয়ে বলা যায়, তাঁর সুললিত কণ্ঠ ও বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল উচ্চারণ হাজার হাজার দায়ক-দায়িকাকে বিমুক্ত করতো, অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতো বহুলাংশে। তাঁর এ দক্ষতা দেখে পূজ্য বনভন্তেও চমৎকৃত হন। আর তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক হতে সংগৃহীত উপদেশ ও পালি সূত্র রেকর্ডিং করায়ে নেন এবং নানা অনুষ্ঠান সমূহেও প্রতিদিন আসা দায়ক-দায়িকাবৃন্দকে সেগুলো বাজিয়ে শুনান আগ্রহ ভরে। এতো গুণ থাকার পরও তিনি কোনদিন আত্মশ্লাঘামূলক কোন কথা বা আচরণ করতেন না। সে ব্যাপারে কারোর সামনে কোন তেজও দেখাতেন না। হুমায়ূন আহমেদ তার একটি উপন্যাসে লেখেছেন– "তেজ দুই প্রকারের। মুখের তেজ আর কাজের তেজ। যাদের মুখের তেজ থাকে তাদের কাজের তেজ থাকে না। যাদের কাজের তেজ থাকে তাদের মুখে কোন তেজ থাকে না।" ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষুর বেলায়ও এ' কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ভিক্ষু বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহোদয়ের দায়িত্বও বেড়ে যায় বহুলাংশে। তাঁর ভিক্ষুত্ব বয়স দশ বর্ষ পূর্ণ হলে বা স্থবির স্তরে উন্নীত হলে তাঁকেই বন বিহারে প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছুক সবাইকে প্রব্রজ্যা প্রদান করতে হতো। পূজ্য বনভন্তে তখন কেবল প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিতেন নিজে প্রব্রজ্যা প্রদান করতেন না। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বর্তমানে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যসঙ্ঘের মধ্যে যারা স্থবির (বা স্থবিরত্বে উপনীত) হয়েছেন, বিভিন্ন শাখা বন বিহারের অধ্যক্ষ ও সাংঘিক কাজে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, তাদের প্রায় জনেরই দীক্ষাচার্য হলেন ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়। আলোচ্য জীবনালেখ্যর লেখক, এ' অধমের দীক্ষাচার্যও হলেন শ্রদ্ধেয় ভন্তে মহোদয়। সে সময় তিনি শুধু দীক্ষা প্রদানই করতেন না, অনুশাসন করার কর্তব্যভারও তাঁকেই বহন করতে হতো। আর সে সব ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনন্যই বলতে হয়। অনুশাসন করতে গিয়ে তিনি গতানুগতিক নিয়মের মতো কঠোর, রুক্ষ ভাব দেখাতেন না, কথাও বেশি বলতেন না। তারপরও নিজের সর্ববিধ

সংযত আচার-আচরণ ও মিতব্যয়ীভাবের দ্বারা নতুনদের জীবন চলার পথে অনুপ্রেরণার উৎস এবং অনুকরণীয় হিসেবে প্রতিভাত হতেন।

এখানে ছোট্ট একটি কথা, যে কথাটি না বললে নয়। অথবা না বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তাঁর সেই অল্প ও ধীরে কথা বলা রীতি নিঃসন্দেহে আমাদের সবার খুবই ভালো লাগতো। তবে সেটা মাঝে মাঝে অন্যদের কাছে কিছু ভোগান্তির কারণ হিসেবে দাঁড়াতো। এ' প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা অবতারণা করছি। ১৯৮৯ সালের কথা। তখন আমি শ্রামণ। জনা পনের স্থায়ী শ্রামণদের মধ্যে দু'জন শ্রামণের সাথে আমার বেশ আন্তরিক সখ্যতা গড়ে ওঠে। আমরা তিন জন মিলেমিশে পাশাপাশি থাকতাম। খাওয়া-দাওয়া, স্নান কর্মাদিও করতাম এক সাথে। একদা আমাদের সাবানের অভাব দেখা দিল প্রখতভাবে। তখন তো আর বর্তমান সময়ের ন্যায় ঠিকমতো দানীয় সামগ্রী মিলতো না। মনে পড়ে একবার আমরা দু'তিনদিন সাবান ছাড়া স্নান কার্য সেরে নিই। আর ক'দিন সেভাবে চলে? সিদ্ধান্ত নিলাম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে র কাছ থেকে সাবান খুঁজে নেবো। সে সময় কোন জিনিস প্রয়োজন হলে হয় পূজ্য বনভন্তের নিকট সরাসরি চাইতো হতো; নতুবা শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হতো। তাঁদের ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন দানীয় জিনিস জমা থাকতো না। পূজ্য বনভন্তের নিকট চাইবার সাহস হতো না বলে আমরা প্রজ্ঞা ভন্তেকেই বেছে নিই। আর সে দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। মোটামুটি সাহস সঞ্চার করে আমি ভোজনশালায় গিয়ে প্রজ্ঞালংকার ভন্তেকে বন্দনা করলাম এবং বললাম– ভন্তে, কয়েকদিন যাবত সাবান ছাড়া স্নান করছি আমরা। আপনার নিকট যদি সাবান জমা থাকে, আমাকে দু'য়েকটা সাবান দিন। ভন্তে তো নীরব-নিশ্চুপ, কিছুই বলছেন না। 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এ দু'টির মধ্যে যেকোন একটি শোনার জন্য আমি বসে থাকি ভন্তের পদপাশে। ভন্তের মুখ হতে কোন শব্দ বের না হলে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম, সংকোচ বোধ এসে চেপে ধরল আমাকে। ভাবতে থাকি, আস্তে করে চলে যাবো নাকি? আবার সেটা করা তো অভদ্রতা পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ থাকবো? না পারছি বসে থাকতে, না পারছি চলে যেতে। অনেকক্ষণ পর ভন্তে

আসন হতে উঠে এসে আলমিরা খুললেন আলতো করে। আর তিনটি 'লাইফবয়' সাবান বের করে দিলেন। আমি সাবান তিনটি নিয়ে বন্ধু শ্রামণদের কাছে ফিরে গেলাম সহসা। আমার হাতে তিনটি 'লাইফবয়' সাবান দেখে তারা বলে উঠলো, সে- কী সবগুলো লাইফবয় সাবান? একটা 'লাক্স' সাবান নিয়ে আসতে পারলে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম– "বলাতো খুবই সহজ। তোমরা একবার গিয়ে দেখই-না। এ লাইফবয় সাবানগুলো পেতে আমার অবস্থা বারটা বেজে গিয়েছিল জানিস! ভন্তে প্রথমে যেরূপ নির্লিপ্তভাব দেখায়ে ছিলেন, আমি তো লজ্জায় খালি হাতে ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। বড়দের সামনে নিজের অসন্তোষভাব দেখাতে নেই বলে সেটা করিনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এগুলো ভাগ্যে জুটেছে বুঝেছিস্। লাক্স সাবান হতে এ'গুলো অনেক উত্তম মনে করো। অবশ্য পরম সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে এগুলো ব্যবহার না করে সযতনে রেখে দেয়া উচিতই মনে করি।" অমনি এক গাল হাসি দিয়ে আনন্দানুভব করলাম তিনজনে মিলে। তথাপি আমি বলব যে, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের এ' গাম্ভীর্য ভাবটুকু অবশ্যই একটা মহাগুণ। এবম্বিধ নানা গুণে তিনি পূজ্য বনভন্তের শিষ্যসঙ্ঘের মধ্যে সবার মধ্যমণি হয়ে উঠেন। নিজেকে বিরাট আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাজবন বিহারে অত্যন্ত করিৎকর্মা সাংঘিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

বিহার অধ্যক্ষ পদ লাভঃ– পরম পূজ্য বনভন্তের নিরলস ধর্ম প্রচারের ফলে বৃহত্তর পার্বত্যাঞ্চলে সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণ সৃষ্টি হয় দারুণভাবে। ভন্তের দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ৯০ দশক হতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে উঠতে থাকে শাখা বন বিহার। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে খাগড়াছড়ির আপামর বৌদ্ধ জনসাধারণের প্রচেষ্টায় জেলা সদরে (মূল শহর হতে ৩ কি.মি. উত্তরে) প্রতিষ্ঠিত হয় "ধর্মপুর আর্যবন বিহার"। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরের বিহার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিহারটি রাজবন বিহারের অন্যতম প্রধান শাখাবন বিহার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিহারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সেখানকার দায়ক-দায়িকাবৃন্দকে পূজ্য বনভন্তের আদর্শ, সদ্ধর্মের বাণী বুঝিয়ে দিয়ে ধর্মতঃ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজন একজন প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ভিক্ষুর। এসব বিষয়

বিবেচনায় ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরকে অধ্যক্ষ হিসেবে বেঁচে নেয়া হয় এবং সেখানকার দায়ক-দায়িকাদেরও সেটাই একান্ত ইচ্ছা বা প্রার্থনা। তারা পূজ্য বনভন্তের নিকট ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার স্থবিরকে তাদের বিহারে অধ্যক্ষ হিসেবে পেতে প্রার্থনা করেন। পূজ্য ভন্তেও শিষ্যের যোগ্যটা জেনে সেই প্রার্থনা অনুমোদন করতঃ ফাং করে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এবার খাগড়াছড়ি দায়ক-দায়িকারা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে প্রজ্ঞালংকার স্থবির মহোদয়কে ধর্মপুর আর্যবন বিহারে অধ্যক্ষ হিসেবে ফাং করেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। উপরোক্ত বিষয় সমূহ অবগত হয়ে তিনিও ফাং গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুর স্বরে 'সাধু সাধু সাধু' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় চারপাশ। অনাবিল প্রীতি ও প্রসন্নতায় ভরে উঠে দায়ক-দায়িকাবৃন্দের অন্তরজগৎ। এ' ভাবে ২৭-০১-১৯৯৫ সালে পরম পূজ্যস্পদ বনভন্তে প্রমূখ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসঙ্ঘের উপস্থিতিতে ধর্মপুর আর্যবন বিহারের দানোৎসর্গ ও বিহার অধ্যক্ষ বরণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। আর প্রজ্ঞালংকার স্থবিরের শুরু হয় সদ্ধর্ম প্রচারের এক নব যাত্রা। খাগড়াছড়িবাসীদের মাঝে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা ও পূজ্য বনভন্তের মহান আদর্শকে ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা। সে-ই হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করে তিনি আপন অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে "ধর্মপুর আর্যবন বিহার" এবং সদ্ধর্ম পিপাসু নর-নারীকে সদ্ধর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দক্ষ হাতে হাল ধরে রয়েছেন।

সাহিত্য চর্চা– সাহিত্য জাতির দর্পণ স্বরূপ। কোন জাতির ধ্যান-ধারণা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনা তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তাই তো বলা হয়, যে জাতি যত উন্নত সে জাতির সাহিত্য তত সমৃদ্ধ। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেসব কবি-সাহিত্যিক, ভাবুক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা তাঁদের জাতির প্রতিনিধি হিসেবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে রূপায়িত করেন। সাহিত্যের সাথে মানুষের হৃদয়-মনের সম্পর্ক। বাক্‌সংযমী সাধক ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার নিজেকে সাহিত্য চর্চা, সাধনায়ও সম্পৃক্ত রেখেছেন নীরবে। তিনি একাধারে লেখক, গবেষক ও অনুবাদক। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদিত গ্রন্থ সংখ্যা খুব বেশী না হলেও বিষয়বস্তুর গুরুত্বে ও নিষ্ঠার মধ্যে কোন খাদ নেই তাঁর রচনায়।

তিনি ত্রিপিটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ধম্মপদ'কে চাকমা ভাষায় **'ধর্মপদর উব'দেজ'** এবং **'মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত'**কে চাকমা ভাষায় কবিতা ছন্দে **'মহাসতিপট্ঠান সূত্র'** নামে দু'টি বই উপহার দিয়েছেন বিদগ্ধ পাঠকমহলে। এছাড়া আরো বেশ কয়েকটি পালি সূত্র চাকমা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। প্রয়াত বাবু সাধন তালুকদারের সাথে যৌথ রচনায় তাঁর একটি চাকমা ভাষায় পদ্যে সূত্রানুবাদ বই বের হয়। এ' ছাড়াও তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত বিভিন্ন ধর্মীয় ক্যাসেট যথা– **'চাঙমা কধায় সীবলীব্রত কধা'**, **'চাঙমা কধায় মহাসতিপট্ঠান সূত্র'**, **চাঙমা কধায় ধর্ম গাথা 'মরণানুস্মৃতি ভাবনা গাথা'**, **'দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা'**, **'বৌদ্ধধর্ম কেন?' 'নরক বর্ণনা'**, **'দেবদূত সূত্র'**, **'ভূক্তানুমোদন সূত্র'**, **'সৎপুরুষ সূত্র'**,– প্রভৃতি সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ'কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, রাজবন বিহার ও অন্যান্য শাখা বন বিহার সমূহে বহু বছর ধরে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই কণ্ঠে রেকর্ডকৃত পালি সূত্রগুলো মাইকে বাজানো হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। ভদন্ত মহোদয় বিভিন্ন সাময়িকী ও স্মরণিকায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক অনেক সু-চিন্তিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেও স্বীয় পাণ্ডিত্বের পরিচয় দিয়ে গণমানসে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন।

ভদন্তের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে যেই কথাটি না বললে নয়, ইদানীং তাঁর সাহিত্যচর্চা কেমন যেন থম্‌কে গেছে; চোখে পড়ছে না। ভাবতে অবাক লাগে যাঁর লেখার ক্ষমতা আছে, তিনি কেন কলমকে অলস করে রেখেছেন! হয়তঃ অনেকেই তাঁর লেখা পড়ার জন্যে চাতকপাখির ন্যায় প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

মহাস্থবির অভিধায় ভূষিত ঃ– ২০০০ সালের ২০শে মার্চ, রোজ মঙ্গলবার, ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহোদয়ের জীবন চলার পথে নেমে আসলো আরেকটা স্মরণীয়, গৌরবের মুহূর্ত। এ দিনের এক শুভক্ষণে ভিক্ষু জীবনের বিংশতি বর্ষ পূর্ণতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে মহাস্থবির অভিধায় ভূষিত করা হয়। এ উপলক্ষে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ধর্মপুর আর্যবন বিহারে। প্রথম দিনে ভিক্ষু সীমা, দ্বিতীয় দিনে নব প্রতিষ্ঠিত সেই সীমায় ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক **"থের-সম্মুতি কম্মবাচা"** পাঠের মাধ্যমে তাঁকে

মহাস্থবির অভিধায় অভিষিক্ত করার কর্মসূচী প্রণীত হয়। তখন তাঁর ভিক্ষু জীবনের ২১ বছর পরিপূর্ণ। এতোদিন ধর্মপুর আর্যবন বিহারে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে এক বছর পর তাঁর মহাস্থবির বরণোৎসব আয়োজন করতে বাধ্য হয় খাগড়াছড়িবাসী। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাজার হাজার দায়ক-দায়িকা সমবেত হয় বিহারে। এবং অবনত শিরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। পড়ন্ত বিকালের শেষ আলোচ্ছতায় সমগ্র বিহার এলাকা যখন আলো মেখে মায়া জড়ানো আঙ্গিকে মহনীয় ও চুপচাপ, তখন দেব-মানবের পূজ্য, অর্হৎ বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যহারে নব প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসীমায় প্রবেশ করেন। এ সময় প্রায় অর্ধ শতাধিক ভিক্ষু যোগদান করেন। আর মহাসমারোহে অনেক প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভারত-বাংলায় সদ্ধর্ম নব জাগরণের অগ্রদূত, বুদ্ধপুত্র, মহামানব বনভন্তের পৌরহিত্যে ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার স্থবিরকে **"মহাস্থবির"** অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়।

উপসংহার ঃ– সময় বয়ে যায় আপন মনে। কারো অপেক্ষায় থাকে না। একদা যারা যুবক ছিল, আজ তারা বার্ধ্যক্যের পথে– কেউ দৃঢ় পথে, কেউ বা ঈষৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে সে পথে। ঋতুচক্রের পালা বদলের সাথে সাথে ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ও আজ ৫৮ বছরের অধিকারী এক নান্দনিক সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। জীবনের ৫৮টি বসন্ত তিনি পাড়ি দিয়েছেন তাঁর জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড-মিনিট-ঘন্টা-দিন-মাস-বছরের প্রতি জানাই আমার হৃদয় স্পর্শ অফুরন্ত শ্রদ্ধা। আজ তাঁর শুভ জন্মদিন। প্রচারবিমুখ এ' সাংঘিক ব্যক্তিত্ব প্রায় সব কর্মই সম্পাদন করেছেন নীরবে, নিভৃতে। তাঁর জ্ঞানময় কর্ম প্রতিভার সমস্ত বিবরণ এ ক্ষুদ্র লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা অসম্ভব।

'জয়তু প্রজ্ঞালংকার'!

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"!

** ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, কাটাছড়ি, রাঙ্গামাটি।*

আমার অনুভবে বিনয়ধর ভিক্ষু প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো

২০০৭ এর 'ফুরমোন' স্মরণিকায় বিনয়ধর ভিক্ষু প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরকে পূজনীয় বনভন্তের প্রথম ও প্রধান শিষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্টের ক্ষণে তিনি আমার এক বছর পরে ১৯৫১তে এ পৃথিবীতে আগত। বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে) তিনি আমার চেয়ে ছয় বছরের কনিষ্ঠ। উপসম্পদা গ্রহণ কাল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে, তিনি আমার চেয়ে ঠিক ছয় বছর পরেই ভিক্ষুত্ব বরণ করেছেন। ব্যবহারিক শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী এবং দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতায়, গ্রন্থ রচনায়, পিটকীয় অনুবাদে আর ধর্ম দেশনায়ও তিনি আমার কনিষ্ঠের পর্যায়ভূক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও সাধক-রত্ন আর্যপুরুষ বনভন্তের একান্ত সান্নিধ্যে তাঁর দীক্ষা ও শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য সহ আপন শান্ত-দান্ত বিনয়ানুকূল পবিত্র ভিক্ষু জীবনাচার পার্বত্য চাকমা হৃদয়কে আজ যেভাবে জয় করে নিয়েছে; তাঁর সেই প্রাপ্তি আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

"বিনযস্‌স নাম সাসনস্‌স আযু"। বুদ্ধের সঙ্ঘের মহনীয়তা দানে বুদ্ধ তথাগত প্রজ্ঞাপিত বিনয় বিধান সমূহ যখন একটি ভিক্ষুর জীবনে পরম শ্রদ্ধা গারবতার সাথে ধারিত হয়, তখন তাঁর সেই উত্তম আদর্শ বিমণ্ডিত জীবন বুদ্ধের ধর্ম রাজ্যের দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভে শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। প্রিয়ভাজন প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির এদেশের বুদ্ধ শাসনের জন্যে আপন জীবনকে সত্যিকারভাবে সেই দুর্লভ উৎসে পরিণত করেছেন। খাগড়াছড়ি ধর্মপুর আর্যবন বিহারে তাঁর বিগত কয়েক দশকের অবস্থান, আজ তদ্‌ঞ্চলে আদর্শ ভিক্ষু জীবনের এক অনুপম দৃষ্টান্তস্থানীয় এবং প্রেরণার উৎসরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

১৯৯৬ এর শেষ প্রান্তে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার হতে আমি যখন কাচালং সারোয়াতলী রিজার্ভ অরণ্যে ধুতাঙ্গ অনুশীলন আর ধ্যান-সাধনার জন্যে গমন করেছিলাম, সে সময়ে দিন কয় প্রিয়ভাজন প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে খাগড়াছড়ি ধর্মপুর আর্যবন বিহারে আমার অবস্থান করার সুযোগ হয়েছিল। পরম পূজ্য বনভন্তের আশ্রয়ে আমার ছয় বছর অবস্থানকালে, আরো বহুবার প্রিয়ভাজন প্রজ্ঞালংকারের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ আমার হয়েছে। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে, তিনি সবার সাথে আছেন কিন্তু কারো সাথে নেই। একান্ত নির্লিপ্ত আপন বিহারী নির্জন প্রিয়, বিবেক প্রিয় এ ভিক্ষু-জীবনটি সত্যিকার অর্থে বুদ্ধ প্রশংসিত একটি আদর্শ জীবন।

ভগবান তথাগত ধর্মপদের পণ্ডিত বর্গে, সত্যিকার পণ্ডিতের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সে ব্যক্তিই সত্যিকারের পণ্ডিত, যিনি নিরর্থক ভক্‌ভক্‌ করেন না; কিন্তু সদর্থ বাক্য ভাষণে প্রবল মেঘের ন্যায় বর্ষণমুখর হয়ে উঠেন। প্রিয়ভাজন প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের স্বভাব চরিত্রে বুদ্ধের এ' প্রশংসা বাক্যের যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর চলনে, বলনেও এক ভাব গাম্ভীর্যতা আপনাতেই বিরাজ করে থাকে। তাই যে কোন দার্শনিক চরিত্র, ভদন্ত প্রজ্ঞালংকারের প্রতি আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য। একবার আমরা দু'জনে গাড়িতে পাশাপাশি বসে রাঙ্গামাটি বন বিহার হতে খাগড়াছড়ি যাচ্ছিলাম। বগাছড়ির এলাকা অতিক্রমের সময়ে শীতের প্রকোপে ম্রিয়মান পাহাড়ী বনাঞ্চল সমূহ দেখতে দেখতে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, প্রকৃতির এ অবস্থা দেখে প্রজ্ঞালংকারের মনে কোন ভাব জাগছে কি? তখন তিনি আমার জিজ্ঞাসা ক্ষণেই উত্তর দিলেন– "অনিচ্চ লক্‌খনা ভন্তে।" তাঁর কাছ থেকে আমি যেটা প্রত্যাশা করেছি সে উত্তরই পেয়েছি, এবং বুঝেছি তিনি সত্যিই আধ্যাত্ম-বিহারী একজন ভিক্ষু।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অবর্তমানে বন বিহার ও তৎ সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুদের অবস্থা কেমন হবে? এরূপ প্রশ্নে মনে হয় তারা জানতে চাহেন, বনভন্তের ন্যায় তৎ শিষ্যদের মাঝে তেমন আধ্যাত্মিক উচ্চ মার্গে কেউ আছেন কি, না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কাছেও এমনটি জানার জন্যে রাঙ্গমাটি বন বিহার কমিটিসহ চাকমা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একবার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বনভন্তে কিছুই বলেননি। তবুও অতি উৎসাহিরা এক কঠিন চীবর দানে বনভন্তের এক

শিষ্যকে আর্য-পুরুষ উপাধিযুক্ত জয় ধ্বনি দিতে দিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পাশে এনে বসিয়েছিলেন তখন দেশনার সময়ে বনভন্তে বলেছিলেন– "বাংলাদেশে বনভন্তে ব্যতীত অন্য একজনও দেখছি না যে, বুদ্ধকে, বুদ্ধের ধর্মকে বুঝতে পেরেছে।" তবুও বনভন্তে ভিক্ষু-শ্রামণদেরকে দেশনায় মাঝে মধ্যে বলে থাকেন, আর্যমার্গ লাভ করতে না পারলেও যদি তোমরা শীল-বিনয় রক্ষায় শ্রদ্ধাশীল গৌরবশীল হও; তা'হলেও তোমাদের কোন কষ্ট পেতে হবে না।

আমি বিশ্বাস করি প্রিয়ভাজন প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের মত শীল-বিনয় গারবী ভিক্ষু যতদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে বিদ্যমান থাকবেন, ততদিন পার্বত্য ও সমতলে শুধু নহে, সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধের বাণী ও তৎ শিক্ষাদর্শের উজ্জ্বলতা দেদীপ্যমান থাকবে। আমার প্রার্থনা থাকবে আমাদের দুর্লভ ধন পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে প্রিয়ভাজন প্রজ্ঞালংকারের মতো গুণাবান ভিক্ষুর সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হোক! এবং তাদের অবদানে বুদ্ধের শাসন এদেশের মাটিতে দীর্ঘ- স্থায়িত্ব লাভ করুন।

"ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!"

** ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, প্রাবন্ধিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, অধ্যক্ষ, রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার, রামু, কক্সবাজার।*

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ঃ বহুমুখী প্রতিভার এক অনন্য পুরুষ

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

পরম শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ প্রতীম শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মদিন আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী পালিত হতে যাচ্ছে শুনে অন্তরে ভীষণ পুলক অনুভব করছি। অত্যন্ত সম্মানার্হ, বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ও প্রতিভাময়ী এমন ব্যক্তিত্বের সম্মানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারম্বরে জন্মদিন উদ্‌যাপনের শুভবুদ্ধি যাদের উৎপন্ন হয়েছে প্রথমে তাদের জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

ভগবান বুদ্ধ মঙ্গলসূত্রের মধ্যে বলেছেন– সমাজে তথা দেশে যারা একান্ত পূজনীয়, সম্মানার্হ, গৌরবনীয় ও ক্ষণজন্মা প্রতিভাময়ী জ্ঞানী-গুণী তাঁদেরকে বিবিধোপায়ে পূজা, সম্মান, সৎকার, গৌরব এবং তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান ও প্রতিভাকে যথাসময়ে সদ্ব্যবহার করতে পারলে, সমাজে তথা দেশে অথবা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে অহর্নিশ মঙ্গলই সাধিত হবে। কস্মিনকালেও অমঙ্গল-দুদর্শা-হতাশা-মনস্তাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। প্রতিভাময়ী জ্ঞানী-গুণীর সাথে সংশ্রব একজন মানুষকে প্রতিনিয়ত কাঙ্ক্ষিত সুখদ পুণ্যময় সম্যক পথেই পরিচালিত করে, কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখপ্রদ পাপময় পঙ্কিল কণ্টকাকীর্ণ বিপথে নহে। অতএব, শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়কে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে যে প্রাপ্য সম্মান জানানো হচ্ছে, তা যে আমাদের ব্যক্তি তথা পারিবারিক জীবনে কাঙ্খিত মঙ্গল বয়ে আনবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির সদ্ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ পার্বত্য বৌদ্ধ জনসাধারণের মাঝে একটি অতি পরিচিত নাম। ঠিক তেমনটি না হলেও সমতলের বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে যারা মহান আর্যপুরুষ দুর্লভ বুদ্ধপুত্র বনভন্তে ও তাঁর শিষ্যসংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা; তদ্গতচিত্ত ও নিবেদিতপ্রাণ তাদের মাঝেও তিনি সমানভাবে পরিচিত। এমন একজন সুপরিচিত ও শাসন-সদ্ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ বীর ধর্মসেনানীর বিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ জীবনকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক ও মূল্যায়নধর্মী নিবন্ধ রচনা করাটা আমার জন্য যথেষ্ট কঠিনতর। কারণ, তাঁর বিগত জীবন সম্পর্কে আমার জানাশোনা সীমিত এবং তার উপর আমার ভাষা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। তারপরও তাঁর আত্মমুক্তি ও পর কল্যাণে উৎসর্গীত সুবিশাল কর্ম জীবনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নে ব্রতী হলাম।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাবের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ জনসাধারণের মাঝে একধরণের গণজোয়ার তথা সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি শুরু হয় মূলত ষাটের দশকের পর থেকে। তৎকালীন সময়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নানা কুসংস্কার ও মিথ্যাদৃষ্টিতে জর্জরিত লুরী তথা রাউলী বৌদ্ধধর্ম এবং মুষ্টিমেয় তথাকথিত থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত চাকমা সমাজে প্রকৃত বুদ্ধের বাণী প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হন। তখন তিনি ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক নানা কর্মকাণ্ডকে সমূলে উচ্ছেদ সাধন মানসে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে এবং সমতলের বড়ুয়া বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের অমিয় সুধা বিতরণ শুরু করেছিলেন বেশ জোরেশোরে। এতদ্‌ঞ্চলের আপামর বৌদ্ধ জনতা পূজ্য বনভন্তের সুললিত ও প্রাঞ্জল ধর্মদেশনায় প্রবুদ্ধ ও উদ্দীপিত হয়েছিল বিপুলভাবে। তখন মানুষ একটু একটু করে অতীতের উন্মত্ত সংক্ষুব্ধ কুসংস্কারবহুল অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে বুদ্ধজ্ঞানে আলোকিত হয়ে বৌদ্ধচিত সুসংস্কার সমন্বিত সুখী-সুন্দর জীবন গঠনে সচেষ্ট হতে শুরু করল।

এভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা যখন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুললিত, প্রাঞ্জল, শ্রুতিমধুর, চিত্তাকর্ষক ধর্মদেশনায় উত্তেজিত, প্রবুদ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত হতে লাগল, তখনই খাগড়াছড়ি জেলাধীন

গামাঢ়ীঢালা গ্রামজাত সুসন্তান বীরলোচন চাকমার তারুণোচ্ছল শুচি-সুন্দর পবিত্র মনে মুক্ত স্বাধীন অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের সুতীব্র বাসনা জন্মেছিল। বৈরাগ্যের স্বাদ নেওয়ার জন্য যিনি সদা ব্যাকুলপ্রাণ, তাঁকে কি আর শোক-সন্তপ্ত, হতাশায় বিধ্বস্ত, দুঃখময় সংসার জীবনে আবদ্ধ রাখা যায়? অতীতের বিপুল পুণ্যসম্পদ, বর্তমানে সৎগুরুর সাক্ষাৎ ও সদুপদেশ আর আপন অবচেতন মনে যখন মুক্ত স্বাধীন প্রব্রজ্যা লাভের অদম্য বাসনা জেঁকে বসে, তখন কি আর সংসারের যাবতীয় মোহমায়া, লোভ-লালসা, মাতা-পিতা তথা আত্মীয়-পরিজনের মায়া-বন্ধন তাঁকে সংসারে আবদ্ধ রাখতে পারে? না, পারে না। আর পারে না বলেই তো ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ নভেম্বর ভরা যৌবনে মহৎপ্রাণ শিক্ষিত যুবক বীরলোচন চাকমা ত্যাগময় পূতপবিত্র প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন মহান আর্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)'র নিকট। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর নাম রাখলেন শ্রীমান প্রজ্ঞালংকার শ্রামন। তখন থেকেই তিনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের স্নেহ-সান্নিধ্যে থেকে শ্রামণ্য জীবনের নীতি-নিয়ম, দৈনন্দিন কর্তব্যাদি মনোযোগ সহকারে শিক্ষা করতে শুরু করলেন। দীক্ষাগুরুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও গুরুগতপ্রাণ হয়ে গুরুসেবা ও বিহারে প্রাত্যহিক কর্তব্যাদি আন্তরিকতার সাথে সুচারুরূপে সুসমাধা করে মান্যবর গুরুদেবের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সাথে তিনি অবসর সময় পেলে নিজেকে নির্জন বিবেক স্থানে বসায়ে ধ্যানে অভিরমিত হতেন। এক বছর দেড় মাসাধিক এভাবে শিশিক্ষু শ্রামণ্য জীবন অতিবাহিত করবার পর ১৯৭৯ সালের ২১ জানুয়ারি এক অতীব শুভক্ষণে দীক্ষাগুরু পরম পূজ্যস্পদ বনভন্তে প্রমূখ প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ ও শত শত সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের সমাবেসে পূজ্যস্পদ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের উপাধ্যায়ত্বে শুভ উপসম্পদা গ্রহণ করেন বর্তমান পুণ্যতীর্থ রাজবন বিহারের পূর্ব পার্শ্বে কর্ণফুলী হ্রদের উপর বাঁশ দিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত **"ভাসমান উদক সীমায়"**। সুচির পোষিত স্বপ্নোদ্যান যেন সেদিন নানা রঙের বিচিত্র বর্ণিল ফুলে-ফলে সুশোভিত হলো। তিনিও জন্ম-জন্মান্তরের প্রভূত পুণ্য প্রভাবে দেব-দুর্লভ ত্যাগদীপ্ত অনাড়ম্বর ভিক্ষুত্ব জীবনে সোৎসাহে নিজেকে করেছেন উৎসর্গীত।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয় এখন বিগত যৌবন একজন প্রবীণ ভিক্ষু। শ্রদ্ধের বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্যেও তিনি এখন জ্যেষ্ঠতম। তিনি আপন মেধা ও প্রতিভায়, ধৈর্যে-শৌর্যে-বীর্য্যে সবদিক দিয়ে বনভন্তের শিষ্যসঙ্ঘের মধ্যে অগ্রত্বের দাবি রাখেন। আসলে তিনি একজন স্বশিক্ষিত, তেজস্বী, অকুতোভয় ও জ্ঞানতপসী। সারাটা জীবন তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করে চলেছেন অব্যাহতভাবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধে, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। তিনি উদার-হৃদয়, ত্যাগী, ব্যক্তিত্ববান, কর্মনিষ্ঠ ও মহৎপ্রাণ। তাঁর সাথে পরিচিতজন মাত্রই জানেন যে, তিনি অত্যন্ত সদালাপী, বিনয়ী, অমায়িক অথচ স্বল্পভাষী। অপ্রয়োজনে কোন আলাপ পছন্দ করেন না। প্রয়োজনবোধে কথা বলেন ভেবে-চিন্তে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে। ফলে তাঁর প্রতিটি কথা অত্যন্ত মূল্যবান ও সারগর্ভ।

তিনি বাংলা ভাষা থেকে চাকমা ভাষায় ধর্মীয় পুস্তকসহ বিভিন্ন সূত্রাদি কৃতিত্বের সাথে অনুবাদ করে সদ্ধর্ম দিকে দিকে প্রচার, প্রসারে তথা শাসন হিতে অমূল্য অবদান রেখে চলেছেন। যে- চাকমা ভাষার লিখিত রূপ এখনো তেমন শক্তপোক্ত হয়নি সে ভাষায় এতটা সাবলীল, চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর শব্দ চয়নে, বাক্য বিন্যাসে সূত্রগুলো অনুবাদ করেছেন যে, ভাবতেও বিস্ময়বোধ হয়। তাঁর অনুদিত– **'ধর্মপদ উব'দেজ', 'চাঙমা কধায় মহাসতিপট্ঠান সুত্র', 'চাঙমা কধায় সীবলীব্রত কধা' 'চাঙমা কধায় ধর্মগাথা'** প্রভৃতি গ্রন্থগুলো বিজ্ঞ পণ্ডিতমহলে ও বৌদ্ধ জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। তিনি উক্ত গ্রন্থগুলো সাবলীল অনুবাদ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার দরুণ সুদীর্ঘকালব্যাপী পণ্ডিত মহলে ও আপামর জনতার হৃদয়ে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়ে বেঁচে থাকবেন।

আমার ধারণা– মানুষ তাঁকে-তাঁর লিখিত গ্রন্থের চেয়ে তাঁর শ্রুতিমধুর, সুললিত মর্মস্পর্শী সুমধুর কণ্ঠের মাধ্যমেই মানুষ তাঁকে দীর্ঘকাল মনে রাখবে। কারণ লিখিত গ্রন্থের রসাস্বাদন করতে হলে, আয়াস স্বীকার করে মনযোগের সাথে গ্রন্থটি প্রথমে পাঠ করতে হয়। অন্যদিকে একজন শ্রোতা শুধুমাত্র তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সামান্য সজাগ রেখে অতি অল্প আয়াস স্বীকার করে সুকণ্ঠির মুখনিঃসৃত কথাগুলোর রসাস্বাদন

করতে পারেন। সেদিক বিবেচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ও আমাদের মাঝে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সুদীর্ঘকাল ব্যাপী। তাঁর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ও প্রতিটি বাক্যের বাচনভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর। তাঁর কর্ণসুখকর কণ্ঠের প্রতিটি ধ্বনি ভক্ত শ্রোতার কানে ধ্বনিত হয়ে হৃদয়ে রসময় অমৃত সুধার মতো অনুভূত হয়। সাগরের লোনাপানি পানের ন্যায় কখনো স্বাদ মিটে না। তাঁর সুললিত সমুধুর কণ্ঠে ধারণকৃত চাকমা ভাষায় **'মহাসহিপট্ঠান সূত্র', 'ধম্ম পদর উবদেজ'** এবং প্রখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী শ্রী কে, শ্রী ধর্মানন্দ বিরচিত, অজিত বরণ বড়ুয়া অনুদিত **'বৌদ্ধ ধর্ম কেন?'**, **'আপনি দায়ী'** সহ **'দেবদূত সূত্র'** এবং তথাগত বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশকীয় কতিপয় সূত্র প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি আজ সুপরিচিত। পূজ্যস্পদ বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্যে শ্রুতিমধুর সুললিত কণ্ঠের অধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয় এখনো অদ্বিতীয়। তাই রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার সহ বিভিন্ন শাখা বন বিহার সমূহে তাঁরই কণ্ঠে ধারণকৃত সূত্রগুলো এখনো প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মাইকে বাজানো হয়। এক সময় স্বয়ং বনভন্তে তাঁরই কণ্ঠে ধারণকৃত সূত্র, 'বৌদ্ধ ধর্ম কেন?', 'আপনিই দায়ী', 'দেবদূত সূত্র' ইত্যাদি ক্যাসেটগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানোপলক্ষে নিয়মিত বাজাতেন।

তাঁর আরো একটি বিশেষ গুণের কথা বলে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছিনা। সেটি হচ্ছে, আমি আগেও উল্লেখ করছি যে, তিনি কথা বলেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং ভেবে-চিন্তে। প্রয়োজনের চাইতে বেশী বলবার মতো লোক তিনি নন। সবসময় জ্ঞানমূলক সদর্থক কথাবার্তা বলতেই তিনি সবিশেষ প্রছন্দ করেন। বাস্তবিকই অপ্রয়োজনে নিরর্থক আলাপ তথা সম্প্রলাপ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভুল-বোঝাবুঝির জন্ম দেয় যা থেকে মানুষের মনে হতাশা, অনুতাপ ও নানাবিধ দুঃখের উদ্ভব ঘটায় মাত্র; পক্ষান্তরে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও বিশ্বাসবোধ গড়ে উঠার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তাঁর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রদত্ত ধর্মদেশনাগুলো যদিও বা অত্যন্ত নীরস, তেমন আকর্ষণীয় নয় এবং ভক্ত শ্রোতার মনে তেমন কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারে না, প্রভাব বিস্ত

ার করতে পারে না। তথাপি ঈষৎ মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করলে বোঝা যায় তাঁর মুখনিঃসৃত উপদেশবাণী কতটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। তাঁর দেশনার মধ্যে নেই কোন অতিশয়োক্তি ও ধর্মের অপব্যাখ্যা। অথচ কী সুন্দর সাবলিল বাক্য বিন্যাসে নীরস ভঙ্গিমায় ব্যাখ্যা করেন বুদ্ধ তথাগতের গভীর তাত্ত্বিক বাণী। তিনি কখনো গতানুগতিক তথাকথিত স্বার্থান্বেষী ভিক্ষুদের ন্যায় আত্ম-প্রশংসা, অপরের অবজ্ঞা ও ধর্মের অপব্যাখ্যা করে, হাস্য-রসাত্মক কথা বলে সস্তা জনপ্রিয়তা ও বিপদজনক লাভ-সৎকার লাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সদা ন্যায়, সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারে ব্রতী।

এমনতরো হাজারো গুণে গুণান্বিত, প্রতিভাদীপ্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের মতো প্রাজ্ঞ ভিক্ষু বর্তমানে বিরল। তাঁর অন্তরলোক সদা মৈত্রীময়। মুখাবয়ব নিয়ত প্রসন্ন। তিনি আপনাকে বুদ্ধজ্ঞানে আলোকিত করে এতদ্‌ঞ্চলের দুঃখ-পীড়িত মুক্তিকামী মানুষের মাঝে জ্ঞানের দ্যুতি ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প। তাঁর সৃজনীশক্তিও ঈর্ষনীয়। আমি তার সৃজন উদ্যানে আরো নব নব সৃজনশীল কর্ম দেখতে চাই, যা আমাদের সমাজকেই আরো সুসংহত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবে। মিথ্যাদৃষ্টির সমূহিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন করবে। সমাজ থেকে ধর্মের নামে নানা কুসংস্কারকে দূরীভূত করে সমাজকে আরো বেগবান ও গতিশীল করবে। চরম উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। পরিশেষে আমি তাঁর নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন প্রার্থনা করছি বুদ্ধ তথাগত ও বনভন্তের সকাশে।

"চিরং জীবতু ভদন্ত পঞ্ঞালংকার মহাথেরো।"

** করুণাবংশ ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।*

প্রজ্ঞালংকার ভন্তে

ভদন্ত অনোমদর্শী থের

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে আমার জীবনে এক স্মরণীয় নাম। যাঁর সান্নিধ্যে আমার প্রাণাধিক প্রিয় কল্যাণমিত্র, সাধকরত্ন পরম পূজ্য বনভন্তে র অনুমোতিক্রমে আমার এই দুর্লভ প্রব্রজ্যা জীবন লাভ। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের জীবনে আমার দেখা-জানা নিয়ে কয়েক লাইন লেখার চেষ্টা করছি। তবে তাঁর গুণ মহিমা লেখার মত ভাষা আমার নেই। তবুও শ্রদ্ধেয় ভন্তের ৫৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কিছু লেখার সাহস করছি। মহান আর্যপুরুষ, পূজ্য বনভন্তে'র শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম সারির যে ক'জন শিষ্য আছেন তন্মধ্যে প্রজ্ঞালংকার ভন্তে অন্যতম। তার কারণ বন বিহারের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আমার শৈশব হতে দেখা। যে ধরণের পরিবেশ ছিল তা বলার নয়। এমনকি পূজ্য বনভন্তের কুটিরটি ছিল খুব সাধারণ শনের ছাউনী। তাই বুঝতে পারেন চারি-প্রত্যয় কি বা মিলতো? সেই অভাবের মধ্যে প্রব্রজ্যা নিয়ে ধৈর্য্য, সংযম না থাকলে আজ এত বছর টিকে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। আমি মনে করি অতীতের বীর্য পারমী আর বর্তমান প্রচেষ্টা যদি না থাকতো তাহলে কোনদিন সম্ভব হতো না। আমি দেখেছি এর মধ্যে অভাবের তাড়নায় অনেক ভিক্ষু-শ্রামণ কাপড় ছেড়ে গৃহী জীবনে চলে গেছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এবং বনভন্তের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তিতে অটল, যার কারণে তাঁর এতটা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি। পূজ্য বনভন্তে বলেন– যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ক্ষয় করতে পারে। তাই আমিও মনে করি শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তেও মৈত্রীগুণে ভরপুর যার মৈত্রীগুণে, শীলগুণে চেহারা সদা উজ্জ্বল, হাসিখুশি এবং আপন মহিমায় তেজস্বী। আর ক্ষমা-মৈত্রীতে দিনরাত তাঁর অমোঘ বাণী সকল প্রাণীর হিত-মঙ্গলার্থে অকাতরে বিলিয়ে

দিচ্ছেন। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় আজ খাগড়াছড়ি ধর্মপুর এলাকাবাসী তথা সমগ্র পার্বত্যবাসী ধন্য। পূজনীয় বনভন্তের অনুশাসন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আচরণ করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি কখনো পরচর্চা-পরনিন্দা পছন্দ করেন না। সকল প্রাণীর প্রতি তাঁর অপ্রমেয় মৈত্রী-করুণা। তাই তিনি দুঃখী জনগণের ফাং (নিমন্ত্রণ) কখনো অগ্রাহ্য করতেন না। যত কষ্টই হোক না কেন তিনি তাদের ফাং বা আমন্ত্রণ সাদরে রক্ষার চেষ্টা করতেন। তাই তিনি আজ সকলের নমস্য ও পূজনীয়। জীবন যার জন্য আজ ত্যাগ ও উৎসর্গ করেছেন সে কেন দুঃখের ভাগী হবেন? মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় আজ সেও নিশ্চয় স্বাধীন। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের ক্ষমা সংযম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মৈত্রী আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা জোয়ার আনতে শ্রদ্ধায় মন-প্রাণ ভরে উঠে এবং আমাদের ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে তুলতে শক্তি জোগায়। তাই আমাদের সকলের উচিত শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের জীবনাদর্শে স্বীয় জীবন গঠনে সচেষ্ট হওয়া।

সাধু! সাধু! সাধু!

** অনোমদর্শী থের ঃ–শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির এর অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য, অধ্যক্ষ, খাগড়া বৈজয়ন্ত বন বিহার, রাঙ্গামাটি।*

বনভন্তের বিনম্র শিষ্য প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির

আদিকল্যাণ ভিক্ষু

পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে তাঁর দীর্ঘ ত্যাগময় প্রব্রজ্যা জীবনের সাধনালব্ধ জ্ঞান যখন আপামর বৌদ্ধদের মাঝে হিতসুখ মঙ্গলের জন্য সদ্ধর্মের সুধা দেশনার মাধ্যমে পার্বত্য কান্তারে প্রতিটি গ্রামে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরই হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী মুক্তির বাণী শ্রবণ করে শত শত বৌদ্ধ কুলপুত্র সত্য ধর্মের নিগূঢ় রস পান করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে পরম পূজ্য বনভন্তের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তেমনি বর্তমানে ধর্মপুর আর্য বন বিহারের সুযোগ্য বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ও একজন অন্যতম। তথাগত ভগবান বুদ্ধের মুখে উচ্চারিত চির সুখ নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করার জন্য দুর্লভ ক্ষণস্থায়ী এ' মানব জীবনকে সার্থক করার লক্ষ্যে হাজারো ইচ্ছাশক্তি নিয়ে ভরা যৌবনে ২৬ বছর বয়সে পূজ্য বনভন্তের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। সেই শুভ দিনটি ছিল ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৭ সাল, রোজ সোমবার। শ্রমণ হওয়ার পর অপূর্ব ভাবরসে তাঁর হৃদয়জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর শুরু হল নতুন জীবন, সকাল-সন্ধ্যা ত্রিরত্ন বন্দনা আর গুরু ভন্তের সান্নিধ্য লাভে তাঁর মন সংসারে টানাপোড়নের বাইরে চলে গেল।

দীর্ঘ প্রায় এক বছরাধিক তাঁর শ্রামণ্য জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলে ১৯৭৯ সালে ২১শে জানুয়ারি, হেমন্ত ঋতুর চতুর্থ উপোসথ, রবিবারে পবিত্র ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের পূর্ব পার্শ্বে কর্ণফুলী হ্রদের উপর বিশেষভাবে নির্মিত ভাসমান উদকসীমায় শুভ উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। ভিক্ষু হয়ে তাঁর মন প্রীতিরসে ভরপুর হলো। তাঁর কাঁধে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। মন চাইলো গ্রাম্য বিহারে না থেকে নির্জনতার সাথে সখ্য করতে। আর তাইতো মনটাকে দূরের কোথাও নির্জন স্থানে নিজেকে লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত এবং অজ্ঞান মুক্ত করার জন্য, গুরুদেবের আদেশ-উপদেশ মনের মধ্যে স্থাপন করে শুরু হলো শীল-

সমাধি-প্রজ্ঞা'র অনুশীলন। তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য হলো শুধু একটাই-দুঃখমুক্তি নির্বাণ। তিনি বিনয়ে যেমনি সুশিক্ষিত তেমনি কায়-মন-বাক্যে সুসংযত। এভাবে সুদীর্ঘ বিশটি বছর পবিত্র ভিক্ষুত্ব জীবন অতিবাহিত হলে' পরে তাঁকে করুণার সাগর পূজ্য বনভন্তে'র উপস্থিতিতে সুমহান ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক "থের সম্মুতি কম্মবাচা" পাঠের মাধ্যমে ১৯৯৯ সনে খাগড়াছড়ি ধর্মপুর আর্যবন বিহারে তাঁকে মহাস্থবির পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁর বিনম্রতা, শিষ্টটা, ভদ্রতা এবং শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন সবারই দৃষ্টি কাড়ে। সত্যিই তাঁর ভাবগম্ভীর সাম্যমূর্তি দর্শনে শ্রদ্ধায় আপনাতেই মন-প্রাণ ভরে উঠে। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং উপাসক-উপাসিকাদের মাঝে অনুপম আদর্শস্থানীয়, অনুস্মরণীয়, পূজনীয় এবং বন্দনীয়। বর্তমানে পূজ্য বনভন্তে র শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে তিনিই সবার বয়োজ্যেষ্ঠ। এতদ্‌ঞ্চলে বুদ্ধ ধর্মকে উজ্জ্বল করতে এবং বনভন্তের সত্যের বাণী প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে তাঁর ভূমিকাও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর মেধা-মনন, বোধশক্তি এবং পাণ্ডিত্বের মহিমা সত্যিই অতুলনীয়। ইতিমধ্যে তিনি **"চাঙমা কধায় মহাসতিপট্‌ঠান সূত্র,' 'ধর্মপদর উব'দেজ'** এবং **'সীবলী ব্রত কধা"** এ' তিনটি বই চাকমা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সংন্দেহ নেই এতে শাসনের, পার্বত্য চট্টলার বৌদ্ধদের বিশেষ করে চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। এছাড়াও উক্ত গ্রন্থগুলো ক্যাসেট আকারেও প্রকাশিত হয়। তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত এ' সূত্রগুলো বিশেষ করে **"চাঙমা কধায় মহাসতিপট্‌ঠান সূত্র"** ক্যাসেটটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রটি শ্রদ্ধা, গৌরবের সাথে শ্রবণ ও পাঠ করলে স্বর্গ লাভ হয়– এ' কথা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ বলেছেন। বৌদ্ধ কুল-গৌরব, স্বধর্ম জাগরণের অগ্রদূত শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও এ' সতিপট্‌ঠান সূত্রটির বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রায়শঃ বলে থাকেন যদি কেউ সতিপট্‌ঠান সূত্র নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপন করেন বা একাগ্র চিত্তে স্মৃতির অনুশীলনে তৎপর হন, অবশ্যই সে ইহ-পর যে কোনকালে নির্বাণ লাভ করতে পারবেন।

আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহান পুণ্য পুরুষ, সাধক শ্রেষ্ঠ, পরম কল্যাণমিত্র, দেব-মানব পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তের পাশাপাশি তাঁরই

উত্তরসুরি শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে মহোদয়ের মতো একজন ত্যাগী, আদর্শবান ভিক্ষু পেয়ে। চলনে বলনে নেই তাঁর কোন চাঞ্চল্যভাব। নেই কোন এত বেশী চাওয়া-পাওয়া। একজন ভিক্ষুর শীল পালনে যতটুকু প্রত্যয়ের দরকার হয়, ততটুকু লাভে তিনি তুষ্ট থাকেন। তিনি সবসময় নীরবে নিভৃতে একাকী থাকতে চির অভ্যস্ত। বর্তমানে দেখা যায়, সাধারণ ভিক্ষুরা নিজেকে জাহির করার জন্য যেভাবে দেশে-বিদেশে ছুটাছুটি করে লাভ সৎকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন, ঠিক তখনি তিনি শুধু পূজ্য বনভন্তের আদর্শ বিনয় নীতিকে মনের গহিনে মালা গেঁথে চেয়ে আছেন মুক্তির পথপানে।

মনে পড়ে, ২০০৪ সনে খাগড়াছড়ি মৈত্রীপুর ভাবনাকেন্দ্রে অবস্থানকালে বীজিতলা বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় গিরিমানন্দ স্থবির মহোদয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। গৃহী জীবনে তিনি ছিলেন একজন সমাজ হিতৈষী স্কুল শিক্ষক; দীর্ঘ চাকুরী জীবন শেষে অবসর গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হন। সেদিন এই প্রবীণ স্থবির অনেক কষ্টে পদব্রজে ভাবনাকেন্দ্রে বেড়াতে আসেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর আলাপছলে ভন্তে মহোদয় তাঁর অতীত স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। এ' প্রবীণ বয়সেও ভন্তের স্মৃতিশক্তি এখনো প্রখর, তিনি অতীতের অনেক কিছু আজও স্মরণ করতে পারেন। তিনি অনর্গল বলতে লাগলেন আর আমি মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকলাম। সেই সময়ে ছিল না তেমন কোন স্কুল-কলেজ, ছিল না শিক্ষার পরিবেশ, ছিল না মন্দির, ছিল না ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ। আমাদের বৌদ্ধ সমাজ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বর্তমানে পূজ্য ভন্তের আবির্ভাবে তাঁর শিষ্যসংঘ বেড়ে যাওয়ার দরুন কিছুটা হলেও প্রকৃত বুদ্ধ ধর্মের নব জাগরণ সূচিত হয়েছে এই পার্বত্যাঞ্চলে। তিনি অকপটে আরো বললেন শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের কথাও। তাঁর ভাষায়– "সে ছিল আমার ছাত্র, খুবই শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের। সে খুব মেধাবী এবং বৃত্তিধারী ছাত্র ছিল।" শুনা গেলো এভাবে শিক্ষাগুরুর মুখেও তাঁর গৃহী অবস্থার গুণকীর্তন কথা। সেই ছোট্ট কালের সুন্দর স্বভাব চরিত্র আর বর্তমানে তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন যোগ হয়ে যেন তাঁকে আজ এতদূরে নিয়ে এসেছে। কোন একদিন তাঁর রচিত ধর্মপদর উব'দেজ

বইটি যখন হাতে পেয়েছিলাম তখন চাকমা ভাষায় কবিতা সুরে আবৃতি করে কি যে আমার ভাল লেগেছিল তা আমি কখনো ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। বইয়ের প্রচ্ছদ ছবিতে তাঁর তরুণকালের সৌম্যকান্ত, সুদর্শন মুখাবয়ব দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর গৃহত্যাগের সালটা দেখে আমার মনে কেন জানি একটা ভাবোদয় হয়েছিল। যে বছর তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন সে বছরই আমার জন্ম। আর সাথে সাথে মনে পড়লো পূজ্য বনভন্তেকেও। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২০ সালের ৮ জানুয়ারি এবং গৃহত্যাগ করেছিলেন ১৯৪৯ সালে। আমার মনে তখন জেগেছিল হাজারো প্রশ্ন- পূজ্য বনভন্তে যখনি নিজের মুক্তির জন্য রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে অনাহারে-অর্ধাহারে অনিদ্রায় গাছ-বাঁশতলায় দিন যামিনী অতিবাহিত করছিলেন তখন আমি এ' মাররাজ্য একত্রিশ লোকভূমির মধ্যে কোথায় ছিলাম– স্বর্গে? নাকি ব্রহ্মলোকে? নাকি চার অপায়ে? আঁহা! ভাবতে অবাক লাগে, সত্যিই আজ নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। একতঃ আমার প্রথম বয়সে দূর্লভ প্রব্রজ্যা লাভ, দ্বিতীয়তঃ পূজ্য বনভন্তের মত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসা। আমাদের ভিক্ষু সমাজের গৌরব, বিনয়ধর ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের সংস্পর্শে এসে নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করি। বয়সে তিনি এখন বিগত যৌবনপ্রায়। বিনয় গারবী, প্রাজ্ঞ এ'হেন সাংঘিক ব্যক্তিত্বের সেবা-শুশ্রূষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্য। নিজের মুক্তির জন্য বক্ষে অনেক স্বপ্ন ধারণ করে পাহাড়সম সাহস নিয়ে আজ হতে প্রায় ৫৮ বছর পূর্বে পার্বত্য শহর খাগড়াছড়ি জেলা সদর থানার অনতিদূরে চেঙ্গী নদীর তীর ঘেঁসে গড়ে উঠা আদর্শ বৌদ্ধ গ্রাম গামাড়ীঢালা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৫১ সালে ঠিক এ'দিনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহী নাম বীর লোচন চাকমা, পিতাঃ- জেরবুয়াধন চাকমা এবং মাতাঃ- বড়চোগী চাকমা। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি হলেন দ্বিতীয় সন্তান। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় ভন্তের মত আরো শত শত আদর্শবান, শীলবান, সুদক্ষ ভিক্ষুর আবির্ভাব হোক- তাঁর ৫৮তম শুভ জন্মদিনে এ'প্রার্থনা।

-০-

** আদিকল্যাণ ভিক্ষু, রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, কাটাছড়ি, রাঙ্গামাটি।*

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের কর্ম ও জীবন

জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু

আমি ৭ এপ্রিল ২০০০ সালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর বেশ কিছু জ্ঞানী-গুণী শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে। তৎমধ্যে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ সমাজ সংস্কারক, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহান কল্যাণমিত্র মানবতাবাদী শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাথেরো মহোদয় অন্যতম। অনুপম মানবিক চরিত্রের একজন আদর্শ ভিক্ষু। তিনি বুদ্ধের প্রশংসিত বিনয়ানুকুল জীবন যাপনই করে যাচ্ছেন। স্বদ্ধর্ম, স্ব-জাতি রক্ষায় তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যায়ের কাছে তিনি মাথানত করেন না। চাওয়া-পাওয়ার প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ তাঁর নেই, বরং উদার এবং পরোপকারী। তিনি যেমন তেজস্বী তেমনি সত্যনিষ্ঠ, বীর্যবান, সহজ-সরল। স্ব-জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

বুদ্ধের প্রধান শিক্ষা হলো– মানব প্রেম ও মানব কল্যাণ। বুদ্ধ সুখী মানুষের চেয়ে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেন বেশী। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ও বুদ্ধ শাসনে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে বুদ্ধের সেই মানবতাবাদকে মুখ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই মানুষের কল্যাণে তাঁর প্রচুর শ্রম, মেধা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শুধু একজন ধর্ম প্রচারক নন, মানবতাবাদী সমাজ সেবক হিসেবে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন। একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্য সাধনা। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জ্ঞান সাধনা ও শাস্ত্র চর্চার সুফল হিসেবে চাকমা ভাষায় ধর্মপদ, মহাসতিপট্ঠান সুত্র অনুবাদ করেছেন। তাঁর কণ্ঠে পাঠ করা সূত্র রাজবন বিহারসহ বিভিন্ন শাখা বন বিহারে সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করা হয়।

বুদ্ধ বাণীর মূল সুর হলো– এস, দেখ এবং উপলব্ধির মাধ্যমে কল্যাণজনক বিষয় গ্রহণ, ধারণ ও অনুশীলন কর। বুদ্ধ সবসময় বাস্তব সত্যকে বড় করে দেখেছেন এবং যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যাচাই-বাচাই কের যা সার্বজনীনতাকে জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর জীবনাদর্শের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের জীবনে এরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত আদর্শ ভিক্ষুর এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। সত্যিই তিনি একজন সৎ, গুণী এবং ত্যাগী ভিক্ষু বলেই সাধ্যমত সমাজ ও সদ্ধর্মের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সমাজে এ জাতীয় আদর্শ, নিঃস্বার্থ, সমাজ দরদী, শাসন হিতৈষী এবং মানবতাবাদী ভিক্ষুর বড় অভাব।

** জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।*

বুদ্ধ ঃ এক আলোক বর্তিকা

–আবুল ফজল

বুদ্ধকে অন্য এক লেখায় আমি 'মানব পুত্র' বলেছি। কথাটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ। আর সে অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং সার্বিক। মানব স্বভাবের এত গভীরে অন্য কেউ প্রবেশ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। সত্যের সন্ধানে তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করেছেন; কিন্তু প্রচলিত আত্ম-নির্যাতন-মূলক সন্ন্যাসকে করেছেন নিন্দা। মানুষের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু অতিরেক আর অভিচারকে করেছেন নিষিদ্ধ। মানুষকে হতে বলেছেন মধ্যেপন্থের অনুসারি। আর বলেছেন, এই হচ্ছে 'প্রজ্ঞা পারমিতা'য় পৌঁছার পথ। 'প্রজ্ঞা পারমিতা' মানে পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা তথা Supreme wisdom- যেখানে ভুল-ভ্রান্তির নেই কোন অনুপ্রবেশ।

প্রাণের অধিকারী বলে মানুষও প্রাণী– প্রাণহীন মানুষ স্রেফ জড়বস্তু, তখন জড়বস্তুর বেশী তার আর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই প্রাণ এক অমূল্য সম্পদ, এক দুর্লভ ধন। মানুষই শুধু প্রাণের অধিকারী নয়- আরো অজস্র প্রাণী রয়েছে মর্ত্যধামে। বুদ্ধি আর বিজ্ঞতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ যুক্তি– যুক্তি বলে সব প্রাণই অমূল্য, শুধু মানুষের প্রাণটাই মূল্যবান এ বুদ্ধি কিম্বা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। অবিশ্বাস্য সাধনা আর দীর্ঘ আত্মনিবিষ্ট ধ্যানে মহামানব বুদ্ধ এ'মহা সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, সব প্রাণই মূল্যবান, সব প্রাণই পবিত্র। প্রাণ-হনন এক গর্হিত কর্ম। সর্ব জীবে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম, –এমন কথা আড়াই হাজার বছর আগে সত্যই অকল্পনীয় ছিল। মানব সভ্যতার তখনো শৈশবাবস্থা– জীবহত্যা তথা প্রাণী-শিকার তখনো তার অন্যতম জীবিকা। যুবরাজ সিদ্ধার্থই ছিলেন এর প্রথম অপবাদক। তখন বীরত্বের বা ক্ষত্রিয় ধর্মের পারাকাষ্ঠাই ছিল মৃগয়া বা পশু–শিকার। সিদ্ধার্থও ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশাবতংস।

তাই, ভেবে অবাক হতে হয় তেমন যুগে তেমন পরিবেশে কি করে একটা মানুষের এমন রূপান্তর ঘটলো। কোন অলৌকিক কিম্বা অপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় তিনি নেননি, যাননি তেমন অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অপ্রামাণ্য শক্তির কাছে। সর্বোতভাবে নির্ভর করেছেন আত্মশক্তির উপর, নিজের সাধনা আর আত্মোপলব্ধির উপর। আত্মোন্মোচন ঘটেছে তাঁর এভাবে। এভাবে ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম পৌঁছেছেন বুদ্ধত্বে। মানবিক সাধনার এক চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ–জীবন। ত্যাগ-সংযমের পথে যে সাধনা তাই মূল্যবান ও ফলপ্রসূ। স্রেফ উপাসনা কিম্বা কর্মহীন প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, তা শুধু নিষ্ক্রিয়তা আর জড় অভ্যাসেরই দিয়ে থাকে প্রশ্রয়। এতে কোন আত্মোন্নতি ঘটেনা, ঘটেনা কোন রকম আত্মোপলব্ধি। অপরিসীম আর অবিরাম চেষ্টা আর উদ্যম-উদ্যোগ ছাড়া আত্মোন্নতি কিম্বা আত্মোপলব্ধির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধিরই এক নাম প্রজ্ঞা। অন্যান্য বহু ধর্মে বিশ্বাসে রয়েছে এক বড় স্থান, অত্যন্ত জোর দেওয়া হয় ঐসব ধর্মে। বুদ্ধ তা করেননি। তাঁর মতে কর্মহীন উপাসনা যেমন নিষ্ফল তেমনি নিষ্ক্রিয় জড় বিশ্বাসও মূল্যহীন। মানুষের যা কিছু উপার্জন তা কর্মোদ্যমের পথেই লভ্য। জ্ঞানের তথা প্রজ্ঞা–পারমিতার যে আলোক-বর্তিকা বুদ্ধ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাও তিনি লাভ করেছেন এ পথেই। মনে হয় বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে– ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেননি। তাঁর জীবন ও শিক্ষা ব্যক্তিগত সাধনারই জয় ঘোষণা। আত্মোপলব্ধির তথা প্রজ্ঞা-পারমিতায় পৌঁছার জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সবের দিকে তাকালেও বুঝতে পারা যাবে তিনি সর্বোতভাবে ব্যক্তিক সাধনার উপর দিয়েছেন জোর। দল বা সমাজবদ্ধভাবে আত্ম-উন্নতি ঘটেনা, আত্ম-উন্নতি ঘটে ব্যক্তিগত চেষ্টা, শ্রম আর সংযমের পথে। তাঁর নির্দেশিত পঞ্চশীলের সবক'টা শীলই ব্যক্তিগতভাবে আচরণীয় ও পালনীয়। প্রাণীহত্যা পরস্বাপহরণ, অবৈধ যৌন সম্ভোগ না করা, মিথ্যা পরনিন্দা কিম্বা রূঢ় কথা না বলা, মদ আর নেশাজনক বস্তু গ্রহণ না করা- ব্যক্তিগত জীবনে সংযম আর ত্যাগ ছাড়া এসব হওয়ার নয়। আনুষ্ঠানিক উপাসনা আর প্রার্থনার সাহায্যে এ'সব আয়ত্ব হতে পারে না কিছুতেই।

বুদ্ধের এ'সব নির্দেশ পালন খুব কঠিন বটে কিন্তু এতে কোন রকম জটিলতা কিম্বা দুর্জ্ঞেয়তা নেই, এ অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। রহস্য-ঘেরা দার্শনিক জটিলতাকে বুদ্ধ কোনদিন দেননি প্রশ্রয়। যেমন অনেক ধর্মের কোন কোন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তোলেন ঃ মানুষ কে, কি? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এ ধরণের অর্থহীন তথা উত্তর–বিহীন প্রশ্নকে বুদ্ধ কখনো আমল দেননি। এসব প্রশ্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু পারে না তাকে সৎ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বুদ্ধের তাবৎ শিক্ষার মূল লক্ষ্য সৎ-মানুষ সৎ-জীবনের পথ-নির্দেশ। চেষ্টা আর উদ্যমের ফলে ক্রমাগতই মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মানস-জীবনে বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রাচীন বহু বিশ্বাস আর সংস্কার ত্যাগ করে মানুষ এখন অধিকতর আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রগামী। একদিন মানুষ জল বাতাস অগ্নি আর চন্দ্র-সূর্যকে, এমনকি বজ্র আর মেঘগর্জনকেও দেবতা মানতো। কিন্তু এখন মানে না কেন? কারণ এখন মানুষের বোধ আর বোধি অনেক বেড়েছে, কালের সঙ্গে সঙ্গে তার মানস জীবন হয়েছে অনেক উন্নত। বুদ্ধের শিক্ষা আর নির্দেশ জীবনে গ্রহণ করা হলে মানুষের আরো যে আত্মবিকাশ ঘটবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। এও বুদ্ধের এক অবিনশ্বর বাণী। এভাবে অতিপ্রাকৃত ও পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে তিনি মানুষকে দিয়েছেন মুক্তি।

কথা আছে ঃ মানুষ প্রবৃত্তির দাস। এ দাসত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া মানুষ কখনো পরিপূর্ণ বোধ আর বোধিতে পৌঁছতে পারে না। একমাত্র আত্মশুদ্ধির পথেই এ দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব– সে পথের নির্দেশ রয়েছে বুদ্ধ-জীবনে, বুদ্ধের শিক্ষা আর বিধি-বিধানে, আদেশ আর নিষেধে।

মানুষ এখন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক সভ্য হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। তবুও পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। সংকটে, সংঘর্ষে পৃথিবী আজ জর্জরিত। যুদ্ধ-বিগ্রহে আর এসব মারামারি, খুনোখুনিতে যে হারছে তার যেমন শান্তি নেই তেমনি শান্তি নেই যে জয়ী হচ্ছে তারও। ব্যক্তির বেলায় যেমন এ সত্য

তেমনি দেশ ও জাতির বেলায়ও এ একবিন্দু মিথ্যা নয়। বুদ্ধ-শিষ্য অশোক জীবনের এ মহাসত্য দু'হাজার বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মন্ত্র-গুরু বুদ্ধের জীবনাদর্শ আর শিক্ষার আলোয়। তাই বিজয়ী হয়েও জয়ের ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ত্যাগ আর অহিংসার জীবনকে নিয়েছিলেন বরণ করে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

বুদ্ধ-জীবন মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর আলোক-বর্তিকা– এ আলোক-বর্তিকা একদিন সম্রাট অশোককে যেমন সত্য, মনুষ্যত্ব আর শান্তির পথ দেখিয়েছিল, আজকের দিনেও সে পথ দেখাতে তা সক্ষম যদি মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে এ আলোক-বর্তিকার দিকে নতুন করে ফিরে তাকায় আর বরণ করে নেয় তাঁকে সর্বান্তকরণে।

বুদ্ধ আর বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের অর্থাৎ অ-বৌদ্ধদের মনে একটা রহস্য-ঘন বিস্ময় রয়েছে। এ বিস্ময়ের বড় কারণ অপরিচয়। বৌদ্ধ-বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যারা জন্মাননি তাঁহাদের কাছে বুদ্ধ-জীবন আর বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়– বিরাট বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের মহাসমুদ্র মন্থনের যোগ্যতা, ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা আমাদের অনেকেরই নেই। ফলে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে আমরা থেকে যাই অজ্ঞ। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় বহু অবিশ্বাস আর সংশয়-সন্দেহের– যা কালক্রমে ঘৃণা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর নানা অশুভ ক্রিয়া-কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম-বিশ্বাস ও চেতনা মানুষের গভীরতম সত্তার সঙ্গে জড়িত– তাই কোন মানুষকে সম্যকভাবে জানতে হলে তার এ সত্তার সঙ্গেও পরিচয় অত্যাবশ্যক। সে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে যেমন নেই তেমনি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও তার অনুকূল নয়। এর ফলে আমাদের জ্ঞান যে খন্ডিত থেকে যায় তা নয়, একটা সুসংহত জাতি কিম্বা সমাজ সত্তা গড়ে ওঠার পথেও আমাদের দেশে এ হয়ে আছে এক দূরতিক্রম্য বাঁধা। অন্ততঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান তথা ধর্মীয় গোঁড়ামী অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সব ধর্মাবলম্বীরাই এ অপরাধে অপরাধী।

মহামানব বুদ্ধের জীবন আর তাঁর শিক্ষা আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর মানবিকতার জন্য। মানব চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে তিনি একদিকে খুঁজে বের করেছেন তার ক্লেদ, গ্লানি, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অন্যদিকে আবিষ্কার করেছেন অসীম শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনার বীজ– যা অঙ্কুরিত হয়ে রূপ নিতে সক্ষম 'প্রজ্ঞা-পারমিতায়' অর্থাৎ পূর্ণ বিজ্ঞতায়। মানবিক শত বন্ধনে মানুষ বাঁধা যা সর্ব দুঃখ-কষ্ট আর শোক-সন্তাপের উৎস– এ বন্ধন-মুক্তির উপায় ও পথ বাৎলিয়েছেন বুদ্ধ। ইংরেজীতে একটি কথা, যার অর্থ ঃ মানুষকে অধ্যয়ন করেই জানতে হয় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে জানার প্রধানতম উপায় মানুষকে জানা, মানুষকে অধ্যয়ন করা।

মহাপুরুষ বুদ্ধ তাই করেছেন। মানুষকে অধ্যয়ন করেই তিনি জেনেছেন মানুষের মুক্তির নিদান। প্রজ্ঞার বিদ্যুৎঝলক যে তাঁর মনে সর্ব প্রথম ঝলছে উঠেছিল সে-ও তো পীড়িত, জরাগ্রস্ত আর মৃত মানুষকে দেখেই। যার ফলে মুহূর্তে শুধু তাঁর ব্যক্তি-জীবনে রূপান্তর ঘটে গেল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হলো তাঁর অন্তর্লোকে সত্যের, করুণার আর প্রেমের এমন এক সূর্য-করোজ্জ্বল দীপ্তি যার কোন তুলনা হয় না। এ মহাসত্যের পথ ধরেই শুরু হলো তাঁর সাধনা– যে সাধনার লক্ষ্য মানুষ আর মানুষের অন্তর্জীবন এবং তার রহস্য সন্ধান। সে সন্ধানে তিনি সফল হয়েছেন। হয়েছেন 'জিন' বা জয়ী। মানব সভ্যতার সূচনার যুগে এ সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এক রাজপুত্র, সুন্দরী স্ত্রী আর সদ্যোজাত সন্তানকে জীবনের জন্য ছেড়ে সত্যের ও মানব মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে এক দুঃসহ বন জীবন বরণ করে নিয়েছেন মানুষের জন্য। এতো এক অত্যাশ্চার্য শিহরণ। হয়তো মহাপুরুষদের জীবন এমনি অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়ই হয়ে থাকে। না হয় তাঁরা মহাপুরুষ হলেন কি করে?

বুদ্ধ-জীবনের মতো ত্যাগ-সাধনা আর মনুষ্যত্বোপলব্ধির এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যই বিরল।

বুদ্ধের শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য নির্বাণ। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস– এ দাসত্বের চেয়ে হীনতম দাসত্ব আর নেই। এ বন্ধন মোচনের বাণীই তিনি শুনিয়েছেন মানুষকে। এছাড়া ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই। ভব-

যন্ত্রণার হাত থেকে চির মুক্তিরই এক নাম নির্বাণ। 'বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ'– এমন আপ্তবাক্যে বুদ্ধ বিশ্বাস করেন না। কর্মহীন বিশ্বাসতো স্রেফ নিষ্ক্রিয়তা, এতে প্রশ্রয় পায় জড়তা, শ্রম-বিমুখতা। বুদ্ধের শিক্ষা আর ধর্মের মর্মকথাই হলো– অবিরত আর অবিচলিত চেষ্টা। তিনি নিন্দা করেছেন অজ্ঞতা, লোভ আর হিংসা-বিদ্বেষকে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এসবকে জড়শুদ্ধ উৎপাটিত করার দিয়েছেন নির্দেশ। শুধু বিশ্বাস বা উপাস্য কিম্বা আরাধ্যের নাম জপ করলে এ হওয়ার নয়। তাই বিশ্বাস কি উপাসনার উপর তিনি মোটেও জোর দেননি। কারণ ঐসবের মধ্যে ব্যক্তির কোন প্রচেষ্টা নেই, নিজেকে রূপান্তরিত করার নেই কোন প্রয়াস। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, গড়ে তোলে তার চিন্তা, তার কথা; তার কর্ম। জড় অভ্যাস নয়। তাই মানুষ বিশ্বাসে তোতাপাখি হোক বুদ্ধ এ কখনো চাননি। মানুষ সক্রিয় হোক। প্রয়াসী আর উদ্যোগী হোক এ তিনি চেয়েছেন, দিয়েছেন তেমন বিধান। সন্ন্যাস এসবের বিপরীত, সন্ন্যাসও একরকম জড়তা। তাই কৃচ্ছ সাধনা ও সন্ন্যাস জীবনকেও তিনি করেছেন নিন্দা। সন্ন্যাস আত্ম-রতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলে অহংবোধ। এসবের অসারতা বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলেছেন– অকারণে শারীরিক কষ্টভোগ কখনো মুক্তির পথ নয়। নয় শান্তি কিম্বা প্রজ্ঞার পথ। মানব মনের উন্মেষ আর বিকাশ যেখানেই ঘটেছে, তা সবই চেষ্টা, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের পথেই হয়েছে, তারই ফল এসব। স্রেফ উপাসনার দ্বারা এসবের কিছুই হয়নি। এযাবত মানবসভ্যতার যা কিছু উন্নতি, তার সবই কর্ম, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের ফল। বুদ্ধের নিজের জীবনও ছিল তাই। এ পথেই তিনি মানব-মুক্তির মহাসনদ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীতে প্রাণের চেয়ে দুর্লভ সম্পদ আর নেই– তাই প্রাণহননের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষেধ তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বাগ্রে। তিনি যে শুধু অহিংসা মন্ত্রই পৃথিবীকে শুনিয়েছেন তা নয়, সে সঙ্গে শুনিয়েছেন কর্ম উদ্যমের বাণীও। ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই এমন দুঃসাহসিক কথা বলেছেন ঃ Prayer is useless, for what is requied is effort. The time spent on prayer is lost and the time spent on effort to achieve something is not lost. অর্থাৎ স্রেফ উপাসনায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা

নিষ্ফল কিন্তু কোন কিছু উপার্জনের প্রচেষ্টায় যে সময় ব্যয় করা হয় তাই ফলপ্রসূ।

এ মহামানব সব রকম সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাই মানুষের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান ঃ দূর করো পুরানো সংস্কারকে, বরণ করে নাও নতুনকে, পরিহার করো পাপ, শ্রেয়কে করো সঞ্চয়। সব রকম পাপ আর বাসনা-কামনার বিরুদ্ধে করো বীর বিক্রমে সংগ্রাম। বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ সকলের দৃষ্টি, এ মহৎ বাণীর প্রতি আবার নতুন করে আকৃষ্ট হোক।

** প্রবন্ধটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল (১৯০৩–১৯৮৩) বিরচিত 'মানবপুত্র বুদ্ধ' পালিবুক সোসাইটি, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে সংকলিত।*

হিতজন

রত্ন কুমার চাকমা

পূর্ব কোন জনমের কর্মের কুশলে
লভিনু জনম দুর্লভ মানবে,
মানব জনম সার্থকের তরে
গৈরিক বসন ধারণ মুক্তির অন্বেষণে।

তিনি খাগড়াছড়ি জেলা শহরের অনতিদুরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মপুর "আর্য বন বিহার" এর অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির। রাতের অন্ধকার শেষে মেঘমুক্ত পূর্ব আকাশে সূর্যের আলোকচ্ছটায় আলোকিত ধরণী স্বরূপ আপন ব্রহ্মতেজে ও অনন্য মৈত্রেয় গুণে আলোকিত মিতভাষী জ্ঞান তাপস। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিরেকে বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে তার লব্ধ জ্ঞান মার্গের পরিধি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। আত্ম-প্রশংসা, অপরের নিন্দা এবং আত্ম লাভ লোভমুক্ত দেশনা তাঁর সন্যাসব্রতের সাধনালব্ধ জ্ঞান মার্গের আংশিক স্বরূপ বটে। সতীর্থদের প্রতি তার অনুরাগ-বিরাগ বিহীন মৈত্রেয়তা আমাদের মাঝে এক অনন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর মৈত্রেয়তার উপদেশ অতীতে পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয় ও পরিস্থিতিতে আমাদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে চলার প্রেরণা দিয়েছে। আবেগে বা অন্য জনের কথায় কিংবা অন্যকে অনুসরণ করে নয় নিজ চিন্তা-চেতনায় সত্যকে এবং প্রকৃত স্বরূপকে জেনে কর্ম সম্পাদন করা প্রকৃত জ্ঞানের ধর্মতা ইহা তাঁর দেশনা উপদেশ হতে শিক্ষা পায়।

ধর্মপুর আর্যবন বিহারে তাঁর অবস্থান এলাকার ধর্মপ্রাণ সকলের এক পরম লাভ। আর্যবন বিহার প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি অদ্বিতীয় শুভাকাঙ্খী। অবারিত চিত্তে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন কাজে তাঁর অবদান অতুলনীয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় সভ্যতার উজ্জ্বল স্মৃতি ও এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ

এবং আর্যবন বিহারকে সমৃদ্ধ করার মানসে তিনি গত ০৩মে, ২০০৪ইং তারিখে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে নিজের ডিজাইন করা বর্তমানে নির্মীয়মাণ দৃষ্টি নন্দন মন্দিরটির নির্মাণের কাজ শুভ উদ্বোধন করেন। বলা বাহুল্য যে, আর্যবন বিহার উন্নয়ন কাজের জন্য অনুদান চাওয়া কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে দান দেয়ার জন্য/ ব্যক্তি বিশেষের দান লাভ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে তাঁর অনিচ্ছুকতা মনোভাব আমরা জেনেছি। স্বনির্ভরতা ও নিজ উদ্যোগে উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করার বিষয়ে তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী। সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাসম্প্রযুক্ত ও স্বপ্রণোদিত দান এবং তাঁর কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রাপ্ত দানীয় অর্থ দিয়ে (বর্তমান দ্রব্য মূল্যে) কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলনের মন্দিরটির নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির এ অঞ্চলের সর্বজন হিতৈষী মৈত্রেয় সাগর। তাঁর উপদেশ ও গুণাবলী আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্মৃতিমান হয়ে সত্য পথের চলার, সত্য ধর্মের আদর্শে অবিচল থাকার সহায় হোক।

সাধু! সাধু! সাধু!

** রত্ন কুমার চাকমা ঃ – সহ-সাধারণ সম্পাদক, উপাসক-উপাসিকা পরিষদ আর্যবন বিহার, ধর্মপুর, খাগড়াছড়ি।*

বুদ্ধের দোকান বা আপণ

কিষ্ট লাল চাকমা

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু রোগ থাকতে পারে, তাদের সেই রোগ চিকিৎসা করার জন্য যেমন বহু ঔষধের দোকান রয়েছে ঠিক তদ্রূপভাবে বুদ্ধও রাগ, দ্বেষ, মোহ, অহংকার মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাবাক্য, ব্যভিচার, চুরি এ'গুলো মানুষের রোগ সদৃশ বলেছেন। সেই রোগগুলো আরোগ্য করার জন্য তিনিও আটটি ঔষধের দোকান রেখে দিয়েছেন।

সে দোকান গুলো যেমন– পুষ্পাপণ, গন্ধাপণ, ফলাপণ, অগধাপণ, ঔষধাপণ, অমৃতাপণ, রত্নাপণ ও নানাদ্রব্যাপণ এ দোকানগুলোর মধ্যে সব ঔষধ এক দোকানে পাওয়া যায় না। যেমন– দশ সংজ্ঞা, দশ অশুভ, চার ব্রহ্মবিহার ও মরণানুস্মৃতি এগুলো পুষ্পাপণে পাওয়া যায়। গন্ধাপণে শীল সৌরভ, ফলাপণে চার আর্যমার্গ ও ফল, অগধাপণে চার আর্যসত্য, ঔষধাপণে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম, অমৃতাপণে কায়াগতানুস্মৃতি, রত্নাপণে সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং নানা দ্রব্যাপণে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ আছে।

তাই বুদ্ধ বলেছেন রোগ অনুসারে যদি ঐ দোকানগুলো হতে ঔষধ সেবন করলে নিশ্চয়ই রোগ মুক্ত হবে। বুদ্ধ আরো বলেছেন উক্ত দোকানগুলোতে ধনী হওয়া, নীরোগী হওয়া, সুশ্রী হওয়া এবং চার অপায়ের পথ বন্ধ করে সুগতি স্বর্গ লাভের ঔষধসহ পরম সুখ নির্বাণ লাভের ঔষধও পাওয়া যায়।

সে দোকানগুলোর ঔষধ চিনবার ও রোগীদের চিকিৎসা করবার মত একমাত্র ডাক্তার হলেন আমাদের আর্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে। তিনি ঐ দোকানের সব ঔষধ ও রোগ চিনেন এবং জানেন বলে বহু বৎসর আগে হতে ঐ দোকানগুলোর ঔষধ সেবন করার জন্য উপদেশ দিয়া আসতেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন।

সে উপদেশ মেনে যারা উক্ত দোকানগুলো হতে ঔষধ সেবন করবেন তারা ইহকালে ও পরকালে পরম সুখ ভোগ করবেন। আর যারা সেই উপদেশ না মেনে উক্ত দোকানগুলোর ঔষধ সেবন করবেন না তারা ইহ-পরকালে অসীম দুঃখ ভোগ করবেন।

জগতের সকল প্রাণী সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হোক!

** কিষ্ট লাল চাকমা, অবপ্রাপ্ত শিক্ষক, মধুপুর, খাগড়াছড়ি।*

জ্ঞানের ভাণ্ডার শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞা ভন্তে

সুমতি রঞ্জন চাকমা

খাগড়াছড়ির ধর্মপুর আর্যবন বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার শুভ জন্ম দিন প্রথম বারের মত উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে ভীষণ ভাল লাগছে। পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুযোগ্য শিষ্য শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞা ভন্তে। তাঁকে দেখলে, তাঁর সাথে আলাপ করলে সত্যিই সমস্ত মন-প্রাণ শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হয়। রাগ ও অহংকার শূন্য, মৈত্রী পরায়ণ, অমায়িক. সরেলা কন্ঠ ও শান্তশিষ্ট অবয়বের অনন্য অধিকারী হিসেবে নিঃসন্দিহে তিনি সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থান নিয়েছেন। শুধু তা' নহে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তথা ভগবান বুদ্ধের উপদেশসমূহ তিনি অত্যন্ত অপ্রমাদের সাথে পালন করেই চলেছেন। যেমন– ক্ষেত্র বিশেষে চক্ষু থাকতে অন্ধের ন্যায়, কর্ণ থাকতে বধিরের ন্যায়, মুখ থাকতে বোবার ন্যায়, শক্তি থাকতে দুর্বলের ন্যায় তিনি অবস্থান করেন।

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে কৃপা পরবশ হয়ে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের ফাং বা আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন। অথচ নিন্দুকেরা বলে যে– বনভন্তের শিষ্যরা আসা-যাওয়ার জন্যে গাড়ী না দিতে পারলে কোন ফাঙে গমন করেন না। তাদের এ'কথা মতেও সত্য নয়। আধুনিক নাগরিক জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত আমাদের 'গোলা কানা পাড়া' গ্রাম। এ' গ্রামের অধিকাংশ দায়ক-দায়িকা গরীব ও অসহায়। এ'সব খেতে খাওয়া অভাবী, গরীব অসহায় দায়ক-দায়িকাদের প্রতি শ্রদ্ধেয় ভন্তে ও তাঁর শিষ্যসংঘ মৈত্রী, করুণাপরায়ণ হয়ে প্রতিবার গ্রামবাসীর আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং সুস্থ থাকলে স্বয়ং ভন্তে ফাং-এ আগমন করেন। অথচ আমরা গরীব বিধায় তাঁদের ঠিকমত সেবা-পরিচর্যা করতেও পারি না। সে

বার খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ-পড়ুয়া অকাল প্রয়াত 'উদয় জীবন চাকমা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞা ভন্তেসহ ভিক্ষুসঙ্ঘ সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে আগমন ও প্রত্যাগমন করেছিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করেও সেদিন তাঁদেরকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যেসব আর্যনিন্দুক, ঘোর মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন দায়ক-দায়িকারা অপপ্রচার চালান– 'বনভন্তের শিষ্যগণ গাড়ি ছাড়া ফাং-এ গমন করেন না' উক্ত ঘটনায় এখন তাদের মন্তব্য কী? শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞা ভন্তে ক্ষমা-মৈত্রীগুণে ঐ'সব মিথ্যা অপবাদকারীদের যথাযথ জবাব দিয়েছেন বলে আমার ধারণা।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞা ভন্তের ৫৮তম জন্ম দিন শুভ হোক। তিনি শতায়ু লাভ করুন, আর বিস্তৃতি লাভ করুক তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান, মুক্তির পথ হোক নির্বিঘ্ন এ'- কামনায়।

** সুমতি রঞ্জন চাকমা ঃ সহকারী শিক্ষক, গোলা কানা পাড়া, খাগড়াছড়ি।*

নীরব দর্শন

রত্ন কুমার চাকমা

কুমার সিদ্ধার্থ বয়োবৃদ্ধির এক সময়ে বৃদ্ধ, রুগ্ন ব্যক্তি, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী এ চার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সকল দুঃখ হতে পরিত্রাণ তথা মানবের দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণ করতেই ঊনত্রিশ বছর বয়সে রাজকুলের সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। ছয় বছর কঠোর ধ্যান-তপস্যার পূর্ণতার মাধ্যমে অন্বেষিত পুনঃজন্ম নিরোধ **"নির্বাণ"** সম্পদ লাভ করে হলেন সম্যক্ সম্বুদ্ধ **"গৌতম বুদ্ধ"**। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ ধ্যান সাধনা-লব্ধ জ্ঞান চক্ষে সত্ত্বগণের উৎপত্তি-চ্যুতি-পুনঃ উৎপত্তি ও বিভিন্ন যোনিতে গমন-বিচরণ এর হেতু সমূহ টেলিভিশনের পর্দায় দৃশ্যমান ছবির ন্যায় দর্শন করেছেন। দুর্লভ মানব কুলে জন্ম লাভ করা, জীবন-জীবিকার মানের বিভিন্নতা, সহায়-সম্পদ লাভী ও হীনতা ইত্যাদি কর্মের বিচিত্র গতি প্রবাহের কার্য কারণ জ্ঞান লাভ করেছেন।

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ অনির্বাণ দেব-মনুষ্যের কল্যাণার্থে, লৌকিক জগতে মানবের কল্যাণ, হিতসুখ ও বিমুক্তি লাভের বিষয়ে স্তর বিশেষে পালনীয় নীতি প্রচার করে গেছেন, দিয়ে গেছেন অমূল্য উপদেশ বাণী। যেমন– গৃহীকুলের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে হচ্ছে পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি যা বৌদ্ধধর্ম তত্ত্বমতে অহিংসা, চরিত্রবান, সুশৃঙ্খল ও সুখী জীবন-যাপনের মাধ্যমে অন্তিমে উচ্চতর ও সুগতি নিশ্চিত লাভের সহায়। অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেকেই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির, ভোগ-ঐশ্বর্য লাভ ও অর্জন করার লক্ষ্যে নিজ নিজ প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। এতে কেউ সার্থক, কেউ বা সুখী কেউ বা নিরাশ-হতাশ। প্রত্যেকের লাভ-প্রাপ্তি কিংবা ইহার বৈপরিত্য সবই যেন পূর্ব ও বর্তমানের কুশল-অকুশল কর্মের ছকে বাঁধা। অতীত ও বর্তমানের আচরণীয় ও কৃত কর্মের স্বরূপই হয়ত নিজ নিজ বর্তমান জীবন প্রবাহ।

প্রসঙ্গতঃ সহজ সরলভাবে বলা যায় যে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত দান-শীল-ভাবনা কর্ম সম্পাদনের উপদেশ বাণী আমাদের গৃহী মানবের কল্যাণের জন্যই।

বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে সমাজে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বৃদ্ধি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ লক্ষ্যণীয়। আমরা গৃহীরা উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও সামর্থানুযায়ী দানকর্ম সম্পাদন করে থাকি ও ধর্মতঃ নিয়মানুযায়ী উক্ত অনুষ্ঠানে পঞ্চশীল গ্রহণ করি। এ'ক্ষণে বিচার্য যে, পঞ্চশীল গ্রহণ শুধুই কী আনুষ্ঠানিক, না আন্তরিক! প্রত্যেকে আপন মনে গভীরভাবে নিজেকে যদি জানি যে, পঞ্চশীল কি কি এবং সেগুলো পালন করি কিনা। সাধারণ দৃষ্টিতে বৃক্ষের উপরিভাগকে দর্শন করার মতো পঞ্চশীলের সরল বঙ্গার্থকে বুঝে হয়ত নিজেকে পঞ্চশীল পালনকারী হিসেবে আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করি। তবে, বৃক্ষের অদৃশ্য অংশ অর্থাৎ মাটির ভিতরে প্রোতিত শিকর স্বরূপ পঞ্চশীলের প্রত্যেকটির বৃক্ষের শিকরের ন্যায় বিস্তৃতি বিদ্যমান। যা ত্রিপিটক গ্রন্থ পাঠে সীমিত জ্ঞানে উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধি হতে অভিমত যে, গৃহীকুলে অবস্থানরত মানবের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে পঞ্চশীল পালনকারীর সংখ্যা অতি স্বল্প সংখ্যক প্রতীয়মান হয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের সমাজে পূর্ব থেকে চলমান কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড বৌদ্ধ ধর্মের নীতি-আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিবাহ অনুষ্ঠান। বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজন ও আপ্যায়নের বিষয়ে আমাদের কারো অজানা নয়। অপ্রিয় সত্য যে, বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজনকারী প্রাণী হত্যার মাধ্যমে আমন্ত্রিতদের ভোজনে তৃপ্তি প্রদান করে আত্ম-সুখ লাভ ও সম্মান রক্ষার প্রয়াস পান। অপরদিকে বিবাহ অনুষ্ঠানে (প্রাণী হত্যা করা) মাংস দিয়ে ভোজনকারী অকপটে প্রাণী হত্যার দূষণীয় কর্মের আংশীদার হন। পঞ্চশীলের এক নম্বর শীল হচ্ছে **"প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা"**। এ শীল সম্পর্কে প্রত্যেকে হয়ত মনে করি যে, নিজে বা নিজ হাতে হত্যা না করলে প্রাণী হত্যা হয় না। ত্রিপিটক পাঠে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাণী হত্যা শীলের বা প্রাণী হত্যা শীল ভঙ্গের নিম্নরূপ কারণ জানা যায়। যথা ১. হত্যাকালে দেখা প্রাণী

মাংস ভক্ষণ করলে, ২. হত্যাকালে প্রাণীর আওয়াজ শোনা বা হত্যা করা হয়েছে বলে শোনা বা জানা সত্ত্বেও সে প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করলে, ৩. হত্যাকালে অদেখা, অজানা বা না শোনা সত্ত্বেও খাবার সময় আমন্ত্রিতদের জন্য তথা নিজের জন্য হত্যা করা হয়েছে– এরূপ ধারণায় মাংস ভক্ষণ করলে, ৪. অন্যকে দিয়ে বা অন্যের দ্বারা প্রাণী হত্যা করালে এবং ৫. অন্যজনকে প্রাণী হত্যা করার জন্য অনুপ্রাণিত, উৎসাহ পরামর্শ প্রদান করলে প্রাণী হত্যা শীল ভঙ্গ হয়।

উল্লিখিত কারণগুলো পর্যালোচনা করে প্রত্যেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করি যে, পঞ্চশীলের মধ্যে **"প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা"** শীল আমি পালন বা রক্ষা করি কিনা। প্রাণী হত্যা শীল পালন ভঙ্গের কারণগুলো পুনঃ পুনঃ একাগ্র মনে পর্যালোচনা করে আত্ম-জিজ্ঞাসায় অন্তরে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, প্রাণী হত্যা শীল পালন ভঙ্গের উল্লিখিত কারণগুলো থেকে আমরা বিরত নই।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের সমাজে বিবাহ-পরিণয় অনুষ্ঠান আয়োজনের কর্মকাণ্ডে পঞ্চশীলের মধ্যে নিশ্চিতভাবে **"প্রাণী হত্যা শীল"** রক্ষার ব্যত্যয় ঘটে থাকে। আমাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান যেভাবেই হোক না কেন বুদ্ধ ধর্মে পালনীয়-আচরণীয় পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি পালন করা প্রকৃত বৌদ্ধ ও ধর্মীয় আদর্শবানের লক্ষ্য নয় কি? যদি তা হয়, প্রাণী হত্যার মাধ্যমে আয়োজন করা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করেও ভোজন সংযমের মাধ্যমে প্রাণী হত্যা কর্মে দূষণীয় খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস্তবে একে একে সবাই যদি সেরূপ অনুষ্ঠানে ভোজনে সংযম ও মাত্রাজ্ঞ হই এবং প্রাণী হত্যা কর্মে দূষণীয় খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণে বিরত থাকি, তা'হলেই সমাজ ব্যবস্থায় আপনা-আপনি প্রাণী হত্যা করে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।

প্রত্যেকে যদি সত্যিকারভাবে বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হই তা'হলে ধর্মীয় আদর্শের নিবিড় চিন্তা-চেতনায় পঞ্চশীল পালন করার স্বার্থে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার শীল পালনে ব্রতী হওয়ায় হবে উত্তম মঙ্গল। পাশা-পাশি বিবাহ-পরিণয় অনুষ্ঠানের সেরূপ সমাজ ব্যবস্থা

থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক ও সামজবদ্ধ ভাবনা প্রয়োজন। বর্তমানে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও সর্বসাধারণের ধর্মীয় চেতনা-বোধের আলোকে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়ত ঘুমের মাঝে অবচেতন মনে স্বপ্ন দেখারই মত। তবে, অবচেতন মনের কোন কোন স্বপ্ন বাস্তবেও পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও সদ্ধর্ম হিতৈষী প্রত্যেকের প্রজ্ঞা আলোয় জাগ্রত বিবেক যদি **"প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকব"** এ শীল পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তা স্বপ্ন নয়, হবে সত্যিই বাস্তব। তাই আলো আর আঁধারের সীমানায় দাঁড়িয়ে না থেকে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সেই চির সত্য অমিয় উপদেশ বাণী **"পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি"** হোক প্রত্যেক হিত-সুখকামী বিবেকবানের দীক্ষামন্ত্র।

সাধু! সাধু! সাধু!

** রত্ন কুমার চাকমা, মধুপুর, খাগড়াছড়ি।*

কিছু কথা

নন্দীদেবী চাকমা

ধর্মপুর আর্যবন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে একটি স্মরণ পুস্তিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেজন্য বিহার পরিচালনা কমিটির প্রত্যক সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সাধুবাদ।

আমি এত ধার্মিকও নই, পণ্ডিতও নই শুধু সাধারণ একজন নারী। তবুও বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যা আমার ধারণা সেখান থেকে কিছু তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের বুদ্ধ ধর্ম হলো সকল ধর্ম হতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পৃথিবীর যত প্রকারের ধর্ম আছে তন্মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মেই নির্বাণ লাভ সম্ভব। তাই বুদ্ধ ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ধর্ম।

ত্রিপিটক শাস্ত্রের সূত্রের ভাষা বা তার অর্থগুলো যদি আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে আমাদের সদ্ধর্ম আচরণ, প্রতিপালনে ও মননে আরো অনেক উন্নতি হতো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ সূত্রগুলোর অর্থ কত যে মূল্যবান, কল্যাণকর, হিতোপদেশমূলক তা যদি আমরা অনুধাবন করতে পারতাম বা সূত্রগুলোর অর্থ আমরা ভালভাবে বুঝতে পারতাম, তবে হয়তো সম্যক্ ভাবে বুদ্ধ ধর্ম আচার-আচরণে, আমাদের অনেক পরিবর্তন আসত। তবুও আজ আগের তুলনায় অনেক ত্রিপিটক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ হওয়াতে শাসনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। যা বৌদ্ধ সমাজের নর-নারীরা পড়ে বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে দান, শীল, ভাবনা ও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা দ্বারা আচরণ ও প্রতিপালন করতেছি এবং বুদ্ধ ধর্মের গুণ কত যে অপরিসীম তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের বৌদ্ধ সমাজের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের চেয়ে জনসাধারণ এবং পুরুষদের চেয়ে নারীরা যেভাবে বুদ্ধ ধর্ম আচরণ ও প্রতিপালনে এগিয়ে এসেছে, ঠিক সেভাবে যদি সাধারণের পাশা-পাশি সমাজের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও যদি এগিয়ে আসতেন, তাহলে হয়তো বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতো। যেমন দেশে ও সমাজে

নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিরা আইন তৈরী করে, আর তা সাধারণ জনগণ মেনে চলে। সমাজে সাধারণ জনগণের চেয়ে নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদের ভূমিকা অতুলনীয় হওয়া দরকার। কেন না তাদের বলিষ্ট নেতৃত্বে, সঠিক দিক নিদের্শনায় জাতি, সমাজ ও দেশ এগিয়ে যায়। সে কারণে আমি মনে করি নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিরাই হলো জাতির কর্ণধার। পাশাপাশি ধর্মীয় গুরু যাঁরা আছেন, তাঁদেরও সদ্ধর্মের শাসন, শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কল্পে এগিয়ে আসা উচিত। তার কারণ উনারাই হলেন শাসন সদ্ধর্মের ধারক-বাহক। জাতির মূলস্তম্ভ হলেন নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, আর সদ্ধর্মের মূলস্তম্ভ হলেন ধর্ম গুরুরা। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে জাতি ও ধর্মের ধ্বজাধারী, দেব-মানব পূজ্য, পরম কল্যাণমিত্র, ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করি এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশ সমূহ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি।

আসুন আমরা সবাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পাশাপাশি তাঁর জ্যেষ্ঠ শিষ্য শ্রদ্ধাভাজন, প্রজ্ঞালংকার ভন্তের মৈত্রী-করুণা তথা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় বিমণ্ডিত জীবনাদর্শ অনুসরণ করে সদ্ধর্ম আচরণে ব্রতী হই।

যা হোক, এ'ধরণের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমাদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হোক এবং আমরা যাতে মৈত্রীগত চিত্তে আমাদের ইহ-পরকালের সুখ-শান্তি, উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য এরূপ যৌথভাবে সুকর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হতে পারি। সবাই যেন সে বিষয়ে যত্নবান হই– আমি সেটাই আশা রাখি।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের উপদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করে আমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হোক। আমাদের নিজের সমাজের, দেশের ও বিশ্ববাসীর পরম কল্যাণ ও সুখ-শান্তি হোক। আর ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার লেখনী এখানেই শেষ করলাম।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"!

** নন্দী দেবী চাকমা, অনন্ত মাষ্টার পাড়া, খাগড়াছড়ি।*

কবিতা

এত সুন্দর তুমি ভন্তে প্রজ্ঞালংকার

পুর্ণময় চাকমা

কী এত সুন্দর তুমি, ভন্তে প্রজ্ঞালংকার!
তোমার ৫৮তম জন্ম দিনে লও বন্দনা আমার।
পরম পূজ্য বনভন্তের সুযোগ্য প্রধান শিষ্য তুমি
তোমাকে পেয়ে ধর্মপুর আর্যবন বিহার হয়েছে পবিত্র পুণ্যভূমি।
নামের সার্থকতা করেছ পরিপূরণ হৃদয়ে একাকার
মহান তুমি, আর্য তুমি আর কত জ্ঞান গরিমার।
তন্ময় হয়ে শুনি তোমার ধর্ম দেশনা
মুর্খ, অবোধ মোরা তাই বুঝিতে যে পারিনা!
ক্লান্তিহীন হয়ে আমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেছ ধর্মের সুধা
বুদ্ধ জ্ঞান লভিতে যেন যায় না তোমার সেই শ্রম বৃথা।
ভগবান বুদ্ধের চারি আর্যসত্য জ্ঞান আর আর্য শ্রাবক বনভন্তের নীতি
করিতেছ প্রতিপালন রেখে অন্তরে প্রীতি।
সবার মাঝে তুমি আদর্শ এক কল্যাণমিত্র
শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা তোমার জীবনের ব্রত।
তাইতো তুমি এত সুন্দর ওহে ভন্তে! প্রজ্ঞালংকার,
লও, লও বন্দনা হাজার বার আমার।

** পূর্ণময় চাকমা ঃ- শিক্ষক, রাঙ্গাপানিছড়া, খাগড়াছড়ি।*

প্রথম জন্মোৎসবে

অনূঢ়া চাকমা

[উৎসর্গ ঃ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের কর কমলে নিবেদিত]

আজন্ম বুদ্ধের নীতি অনুসরনিয়া
গৃহত্যাগি তুমি, কর্মযোগী বীর
মুক্তি মার্গের পথিক তুমি, সংসার-ত্যাজিয়া
মুক্তি সন্ধানে রত সাধনায় ধীর ॥

প্রব্রজ্যার কঠোর বিনয়-নীতি গ্রহণ করিয়া
সদ্ধর্ম প্রচারে ব্রতী তুমি স্বদেশ বাহির
জ্ঞানের সর্পিল পথ পরিভ্রমিয়া
লভেছ মুক্তির স্বাদ হে মহাস্থবির!

মুক্তির তরে তব জীবন সাধনা–
সত্যের দিশারী রূপে জ্ঞানের আলোক
লভিয়া অমৃত রস বিলায়ছ ভু-লোক;
আদর্শ জীবনে নিত্য সত্য আরাধনা।

আদর্শ সংযমী বীর জিতেন্দ্রিয় বেশে–
আজি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তব প্রথম জন্মোৎসবে ॥

অনূঢ়া চাকমা, অপর্ণা চৌধুরীপাড়া, খাগড়াছড়ি।

অনিত্য সংসার

রিমি ও ঝিমি দেওয়ান
গরগজ্যাছড়ি, খাগড়াছড়ি।

[উৎসর্গঃ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে'র ৫৮তম শুভ জন্মদিন স্মরণে]

জীবনের যবনিকা
অন্তরালে যবে–
যাবো চলি তুমি-আমি-
ত্যাজি এই ভবে,
তারপরও বহুদিন
এ ধরণী রবে;
আমাদের এ নিত্য আসা-যাওয়া,
কে'বা খোঁজ লবে.....?
নহে গো সত্য, এই জগৎ সৃষ্টি
সত্যের ধারণা-
সে শুধুই অলীক মিথ্যাদৃষ্টি।
শূন্য এটা- স্বপনের ছায়া।
জ্ঞানী যাঁরা বলেছেন–
এই জগৎ শুধু মিথ্যা-মায়া ॥
তবে কেন মানব মনের
এত চাওয়া-পাওয়া?
অনিত্য এ ভব সংসারে–
মিথ্যা-মায়া-স্বপ্ন জালে
চিত্ত কেন হেথায়
বৃথা ঘুরে মরে.....?

প্রার্থনা

রিয়া, মায়া ও শাসনা চাকমা

[উৎসর্গঃ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের করকমলে]

দয়া ক'রো ভগবান,
ভগ্ন এ প্রাণ
শৃঙ্খলিত জনে–
এই মোর মিনতি চরণে।
আশা ক্ষত এই অন্তর।
হে প্রভু, হৃদয়েশ্বর!
ক্ষমা করো সব অপরাধ,
পেতেছিনু দু'হাত,
পুরাইতে সাধ
লভিবারে আস্বাদ,

পুষ্পমাল্য করিনু গ্রহণ
পুঁজিতে তব রাঙা চরণ ॥
পাপের মদিরা পানে মত্ত
মোর দূরন্ত হৃদয়,
শান্ত ক'রে দাও তারে
কৃপা দানে ওগো দয়াময়!

ক্ষমা ক'রো, যদি আমি
ক'রে থাকি কোনও অপরাধ,
তপ্ত প্রাণে চাহে না কিছু
যাচে শুধু তব আশীর্বাদ ॥

আমারে কাড়িয়া ল'ও
আমা হ'তে আজ
ওগো বিশ্বরাজ!

নিত্য আত্ম-প্রবঞ্চনা হ'তে
কোনও মতে
তুমি ভগবান,
দাও মোরে, দাও গো মুক্তিদান ॥

যুক্ত করো তোমাতে এ প্রাণ।
ধরণীর ধূলিম্লান
সদ্‌সতে বদ্ধ এ হৃদয়!
ওগো প্রভু দয়াময়!

আজিকে সকল সত্তা ভুলাও হে মম,
শৃঙখল খসা'য়ে মোরে লহ প্রিয়তম ॥

** রিয়া, মায়া ও শাসনা, খাগড়াছড়ি।*

নির্বাণ দর্শন

বি. ভিক্ষু

[উৎসর্গঃ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের প্রথম জন্মোৎসবে]

দেখা যদি পেতে চাও তার
ছাড়ো এই অনিত্য সংসার,
ছিন্ন ক'রো জীবনের যত কিছু কঠিন– বন্ধন!
সংসারের শত পাকে বদ্ধ জীবগণ ॥

পাবে না দেখিতে কভু তারে
বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে–

অবিদ্যা-তৃষ্ণার মায়া-মোহ নাগপাশ
না যদি করিতে পারো নাশ–
নির্বাণ পাবে কি দর্শন?
ওরে সে যে বহু জনমের সাধনার ধন!

** বি. ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি*

ধর্মগুরু

জিনা চাকমা

ধর্মগুরু তুমি,
মহান আত্মত্যাগী।
পাপকে পরিহার করে,
হয়েছ তুমি সুখাভিলাসী।
সদা সত্য জ্ঞানের প্রভাব,
দিয়েছিলে অজস্র ঢেলে খাগড়াছড়ির মাটিতে,
তোমারই আলোকে আলোকিত
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জনপদ।
হে ধর্মগুরু! জাতি, দেশ ও সকল প্রাণীর মঙ্গলার্থে
এসেছিলে তুমি দেখাতে মুক্তির পথ।
তোমার সুন্দর মুখের অমীয় বাণী,
শুনি যত হয় পাপহানি।
তাইতো বিলিয়ে দিলে,
সাম্য মৈত্রীর ও শান্তির বাণী।
তোমারই মূল্যবান জ্ঞান,
স্মরণীয় রেখেছিলে পার্বত্যবাসীর মনে
তাদের মাঝে হয়েছিলে তুমি,
মহান সুক্ষ্মদর্শী ধর্মগুরু ॥

---

* *জিনা চাকমা, খুল্যাং পাড়া, নানিয়ার চর।*

ঘন কুয়াশার নীড়ে

আর. কে. ভিক্ষু

ঘন কুয়াশার নীড়ে
মানুষ অনন্ত কাল ধরে চলেছে দীর্ঘপথ;
দেখা যায় সামান্য দূরে,
আঁকা-বাকা চড়াই-উৎরাই পথ;
মানুষের প্রাণ হয় যান;
সংসার পরিক্রমায় যেন এইটি মহান।

ঘন কুয়াশার নীড়ে
মনভাবে দেখি ঐ অনেক দুরে,
আসলে দেখিতে পায়
শুধু এক বিঘত–
যা এক জন্মের ঘূর্ণন;
নিজেকে তবুও ভাবে আকাশ প্রমাণ।

ঘন কুয়াশার নীড়ে
দেখিবে কেমন করে অনন্ত,
কর্মের অলি-গলি পথ;
কর্মের চাকা সদা ঘুরছে
ঘুরন্ত লাঠিমের মত।
জানে ক'জন ইহার কারণ?
তাই কর্মকে সবাই বলে
ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান,

সৃষ্টি ধ্বংস আদি-অনাদি খুঁটি গেঁরে
করে রেখেছে এর দৃঢ় বন্ধন;
রুদ্ধ হলো জীবের মুক্তির পথ
জড়িয়ে ধরেছে মানুষ,–
মুষ্টিবদ্ধ ভ্রান্ত মতবাদ।

ঘন কুয়াশার নীড়ে
পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে সাদা কাফন,
এতেই হয় বারে বারে লাশের দাফন।
মৃত আত্মার স্বস্তির তরে
ধুম-ধাম যজ্ঞ করে
না জেনে তার গতির কারণ ॥

ঘন কুয়াশার নীড়ে
ঘুড়িয়ে নিয়েছে মোড়,
ভুলে গিয়েছে মানুষ
বিনয়, সুনীতি, শিষ্টাচার;
হিংসা বিদ্বেষ হানা-হানিতে
অলীক কল্পনা হয়েছে তাদের
স্বর্গ মোক্ষ নির্বাণ দ্বার
জীবন উন্মত্ততায় রয়েছে পড়ে,
ঘন কুয়াশার নীড়ে ॥

◈◈◈ ◈◈◈ ◈◈◈

** আর. কে. ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।*

আজি তোমারি স্মরণে

– গিরিমানন্দ ভিক্ষু

তোমারি শুভ জন্ম বার্ষিকী স্মরণে আজি
লিখছি কবিতা;
নিবেদন করিতে প্রণাম
নেই তো মোর সেই ভাষাজ্ঞান।
যা দিয়ে সাজাতে পারি
তোমার শুভ জন্মদিন আর
দীর্ঘ বৈরাগ্য জীবনের মহাত্ম্য।
পারবো না হয়তো এ' ক্ষুদ্র লেখনিতে
তোমার মহৎ জন্ম বার্ষিকী জাগিয়ে তুলতে
চাই শুধূ এই শুভ দিনটিতে
তোমার জন্ম স্মারক পুস্তিকার
নিরালস্য লেখনি সঙ্গ দিতে।
আজ তুমি দীর্ঘ ৩০টি বছর
অতিক্রম করেছিলে, বুদ্ধের শাসন
সুখের মহিমায়;
পবিত্র তব সেই বৈরাগ্য জীবন;
দুর্দান্ত মারের অধরায়।
ছুটে চলিছ দৃঢ় বীর্য ল'য়ে
বুদ্ধের আবিস্কৃত মার্গ পথ ধরে
ক্লান্ত নহ তুমি এখনো
যতক্ষন না পৌঁছাবে সুখের ঠিকানায়।
প্রব্রজ্যা নিয়েছিলে হয়তো সংকল্পবদ্ধ হয়ে,
সকল বন্ধন ছিন্ন করি, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা দিয়ে।
সংসার চক্রের তীব্রগতি স্তব্ধ করবে
রুদ্ধ করবে জন্ম-মৃত্যু, হঠাবে মার
হে শ্রদ্ধেয় ভন্তে, প্রজ্ঞালংকার!
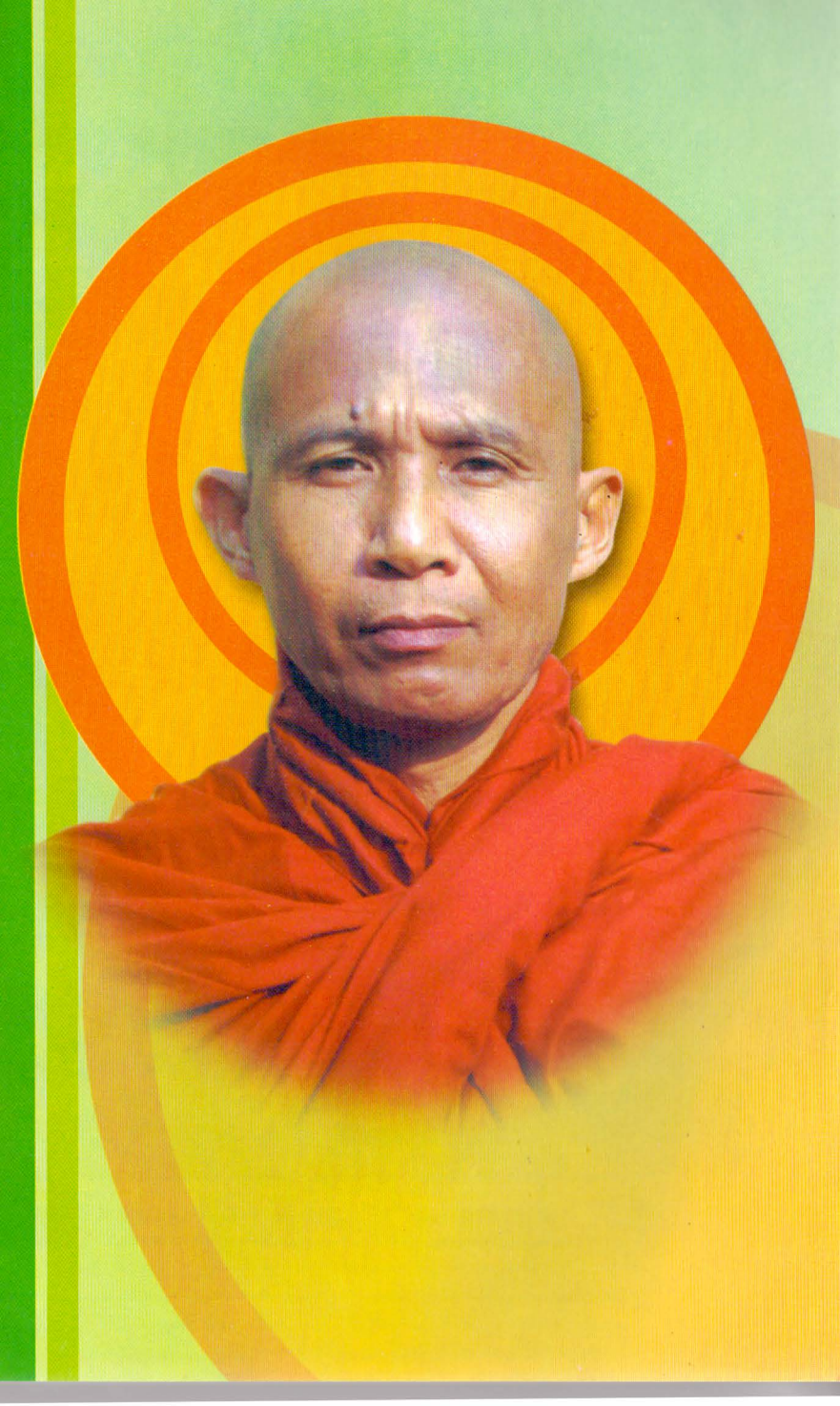
গিরিমানন্দ ভিক্ষু, খারিখ্যং শাক্য বন বিহার, বন্দুকভাঙ্গা, রাঙ্গামাটি।